রাবেয়া খাতুন

নির্বাচিত গল্প

নির্বাচিত গল্প

রাবেয়া খাতুন

মুক্তধারা ১৪৭৪

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
প্রচ্ছদ – শিল্পী হাশেম খান

কম্পিউটার কম্পোজ
বাংলা কম্পিউটার সার্ভিসেস
৯ সার্কিট হাউস রোড কাকরাইল
ঢাকা ১০০০

মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস ৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০
মূল্য ৫০.০০ টাকা

NIRBACHITA GALPA
[Selected Short-Stories]
By Rabeya Khatun
First Edition February 1990
Cover Design Hashem Khan
Publisher C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Price Taka 50.00

আকবর, খোকা, ফাতেমাকে

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

মধুমতি, সাহেব বাজার, অনন্ত অন্বেষা, মন এক শ্বেত কপোতী, রাজাবাগ শালিমার বাগ, ফেরারী সূর্য, অনেক জনের একজন, জীবনের আর এক নাম, দিবস রজনী, হানিফের ঘোড়া, মোহর আলী, নীল নিশীথ, সেই এক বসন্তে, মিতসামারে, বায়ান্ন গলির এক গলি, পাখি সব করে রব, নয়না লেকের রূপবান দুপুর, হিরণদাহ, ই ভরা বাদর মাহ ভাদর, সে এক যাবজীব

ছোটগল্প

আমার এগারোটি গল্প, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী

কিশোর উপন্যাস

দুঃসাহসিক অভিযান, লাল সবুজ পাথরের মানুষ, সুমন ও মিঠুর গল্প, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা

সূচীপত্র

উড়োকণ্ঠ	৯
মামা আমির	১৮
গতি মুখ	৩০
কৃতজ্ঞতা	৩৫
ব্যর্থ প্রতিবাদ	৪০
মোমের ইলিশ	৪৫
বাগানের নাম মালিনচেরা	৫০
সুবর্ণর সঙ্গে দেখা	৬৫
নাগ মূর্তির হাটে	৮২
এখনো	৮৮
কালোরাত কালো জোছনা	৯৭
নিরন্তর ঘন্টা	১০০
তারার তৃষ্ণা	১০৭

উড়োকণ্ঠ

রানা কখন ঘুম থেকে উঠেছিলো রাকা একদম টের পায়নি। পড়ার টেবিলে ঘড়ি। বাজে মোটে সাড়ে সাতটা। এ বাড়ির কেউ ওঠে না এতো ভোরে।।

দরোজা ভেজিয়ে রানা কাটার তালে যখন, লেপের তলা থেকে একটা চোখ বের করে রাকা ডাকলো, এ্যাই!

রানা চমকালো সামান্য। দু'পাল্লার মাঝে মুহূর্তের জন্যে ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়েও গেলো। তারপর দুপা ভেতরে বাড়িয়ে, কাছাকাছি তৃতীয় কেউ না থকেলেও ফিসফিসিয়ে বল্লো, মন্টিদের বাসায় যাচ্ছি।

এতো সকালে ওখানে ক্যানো।

দশটার ফ্লাইটে ওর মামা বার্মিংহাম যাচ্ছেন।

তাতে তোর কি?

রাকা ঝট্‌তি বিছানায় উঠে বসে বল্লো, দিন দিন পাগলামো বেড়েই চলেছে, না! ডাকবো মাকে?

প্লিজ আপা।

নো প্লিজ ভাইয়া। প্রমিজ কর এই শেষ।।

রাকার কথা কানে নিয়েছে কি নেয়নি, তার আগেই কার্পেট টপকে পিঠটান দিয়েছে রানা।

রাকা আবার লেপের ওমে ঢুকলো। শীত বেশ কনকনে। বাইরের রোদ জর্দা রং গাঁদা ফুলের পাপড়ির মতো। উত্তুরে হাওয়া পাত্তাই পাচ্ছে না। মিস্টি মিস্টি আমেজ। এমন বিহানে আবার ঘুমিয়ে যেতে পারলে কি চমৎকারই না হতো। শুধু মিঠে রোদ্র নয়, ছুটির দিনও বটে। মা উঠবেন যেনা বেনা করে। সায়ফুন মামা দশটার আগে তো নয়ই। মন্টিদের ফ্ল্যাটের দূরত্ব অনুমান করতে চেষ্টা করলো রাকা। সবুজবাগ থেকে আরামবাগ। খুব কিছু দূরের পথ নয়। রেল লাইন ধরে এগুলে বেশ কাছে। কিন্তু ঐ রাস্তাটা নিয়েও ভাবনা। হর বছর কতো লোক যে কাটা পড়ে। পুরো ঢাকায় বিপজ্জনক পয়েন্ট যে ক'টা রয়েছে ঐ লেভেল ক্রসিং-এর দিকটা তার মধ্যে দু'নম্বর। রেল কোম্পানি থেকে যদিও দুদিকে দেড় মানুষ সমান দেয়াল তুলে দিয়েছে, তবু কেমন করে যেনো ঘটে যায় ঐসব ভয়ংকর ঘটনা।

গোটা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শহর একটা হলেও রোদের তেজ কি সব জায়গায় সমান? যদি ওখানে ঘন কুয়াশা থাকে আর রানা লাইন পার হবার সময় রক্তলাল দু'চোখ রাঙিয়ে এগুতে থাকে একটা ট্রেন? মহাতংকে আঁৎকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামাল দেয় রাকা। কি যা তা অবাস্তব ভাবনা। রানা ফোরের ছাত্র হলেও বুদ্ধিতে সেয়ানা।

আরাম করে আবার লেপের তলায় ঢুকতে গিয়েও পারলো না। দ্বিতীয় চিন্তায় আবার আক্রান্ত। প্রথমটায় প্রচণ্ড রাগ এলো মার ওপর। এসব ভাবনা তাঁরই ভাবার কথা ছিলো। অথচ তিনি ঘুমুচ্ছেন, আর সে জেগে। রাগটা বাড়তে গিয়ে মোড় নিলো ভয়ে। ছুটির দিনের আলসেমি নিয়ে মস্টিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বা খেলতে খেলতে যদি দেরী করে ফেলে, মাকে উঠে দেখতে হয় নাস্তার টেবিলে অনুপস্থিত রানা, লঙ্কা কাণ্ড বেধে যাবে তাহলে। অকারণে বাসা থেকে বেরুনো একদম পছন্দ নয় মার। তার ওপর যদি ধরতে পারেন যাওয়ার কারণ, তবে তো কথাই নেই। কি যে হবে।

রানাকেও যেনো পেয়েছে এক অন্তহীন পাগলামিতে। বাবা এদেশ ছেড়ে চলে গেছেন ছ'মাস তো হবেই। যাবার আগে ঠিকমতো বিদায় জানানোও সম্ভব হয়নি। স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও অনেক দিনের মতো। ওরা বেরুতে এগিয়েও এসেছিলেন। সে ইতস্তত করছিলো। কিন্তু রানা একচোটে কাছে যেতে চেয়েছিলো। পারেনি। মা এসে গেছিলেন মাঝখানে। মার সঙ্গে এক রিকশায় রোজ তারা বাড়ি ফেরে। সেদিনও তিনিই নিতে এসেছিলেন। রানাকে যেতে দেওয়া হয়নি। উল্টো ওদের বসিয়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে মা কথা কাটাকাটি করে এসেছিলেন বুম্বা মিয়ার স্টলের ধারে দাঁড়িয়ে। বাড়ি ফিরে রানাকে কাঁদতে দেখে দু'ঘা লাগিয়ে দিয়েছিলেন পিঠে। দাঁত ঘষে বলেছিলেন, লজ্জা করে না অমন মানুষের জন্য চোখের পানি খর্চা করতে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে একটা।

ওসব বাবা নয়, তুমি।

কান্নার ভেতর লাইনটা উচ্চারণ করে সেদিন দোহারা, তেহারা মার খেতে হয়েছিলো রানাকে। মাও এতো গরম হয়ে গেছিলেন, মাঝে সায়ফুল মামা এসে না পড়লে রক্তারক্তি কাণ্ডই ঘটে যেতো।

ঘুমতে এসে প্রায় রাতেই এখন জেদী ভঙ্গিতে ফোঁসফোঁস করে রানা— দেখিস আপা আমি ঠিক একদিন বাবার কাছে চলে যাবো।

তুই কি জানিস বাবা কোথায় গ্যাছেন?

যোগাড় করেছি খবর। বার্মিংহামে আছেন। জায়গাটা কোথায়রে আপা?

লণ্ডনে। ঠিক লণ্ডন নয়। মূল শহর থেকে শ'খানেক মাইল

দূরে আর একটা ছোট শহর। আমরা মজা করে যে ক্যাডবেরী চকলেট খাই না, ওখানেই ওর জন্ম।

অন্য সময় হলে ক্যাডবেরীর নামে রানা লাফাতো। তার বদলে ওকে দেখাচ্ছিলো বিষণ্ণ— তবে তো লণ্ডনের কাউকে দিয়ে আশা নেই।

আরে বোকা, বিলেত কি আমাদের দেশের মতো। ওখানের দু'শো তিনশো মাইলের দূরত্ব কিছু নয়। আর বার্মিংহাম থেকে তো শুনেছি লোকজন এসে অফিস করে লণ্ডনে।

তাহলে তো সমস্যাই গ্যালো। ঠিক একদিন----

কি একদিন ?

প্লেনে তো যেতে পারবো না। টাকা শুধু প্রশ্ন নয়, রয়েছে মেলা নিয়ম, কানুনের ঝক্কি। সুযোগ মেলে এখানে থেকে চাট্‌গা, সেখানে থেকে কোনও একটা জাহাজে চড়ে---

লাইনটা শেষ না করে দু'আঙুলে তুড়ি বাজিয়েছে রানা। আর আশংকায় কাতর হয়ে গেছে রাকা। এসব এমন ব্যাপার ক্লাসের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকেও বলা যায় না। যাকে বলা যেতো সেই মাই কি আর আছেন আগের মতো। এগুলো তাঁকে বলতে গেলে বিপরীত ফল হবে। অথচ রানার মাথা থেকে এই চিন্তা দূর করা দরকার। নইলে--

ভাবতেও ভয় পায় রাকা। ঐটুকু রানা। ও একলা রাস্তায় বেরুবে। তাছাড়া জাহাজই হোক, প্লেনই হোক বিলেত কি ঘরের কাছে? না লণ্ডন একটা ছোট্ট শহর। ক্লাসের রিংকি রিমির শৈশব ওখানেই কেটেছে। ওদের কাছে জেনেছে সে নগর কতো প্রকাণ্ড। কারো খবর কেউ রাখে না। সময় নেই। যে যার প্রয়োজনের চর্কিতে ঘোরে। সেখান থেকে ট্রেনে, বাসে বার্মিংহাম যেতে সময় বেশি লাগে না, কিন্তু পুরোপুরি অচেনা জায়গায় ভিনদেশী এক কালো ছেলে ক্যানো এসেছে, কাকে খুঁজছে আগ বাড়িয়ে কে জানতে আসবে। যদিও ইংরেজী রানা বলতে পারে চমৎকার। তবু সমস্যা কতো রকমের।

সেই সব রাতে রাকার ঘুম আসতো না। তারপর আপনা থেকে পেয়েছিলো একটা বুদ্ধি। রানার সঙ্গে জরুরী গোপন কথা বলার সময় রাতে। মা, মামা পাশের ঘরে দরোজা বন্ধ করার আগে ওদের এসে শুতে হয়। পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল খাট। মাঝে টেবিল ল্যাম্প, দু'গ্লাস পানি, রেকাবিতে আপেল কমলা যা রেখে যান। শুধু ফল নয়, টিনে শুকনো খাবারও থাকে যদি কখনো খিদে পায়। সত্যি সত্যি সেগুলো কাজে লাগে রাত জাগার সময়। রাকা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, কি রে সেই মতলবটা মাথা থেকে গ্যাছে?

যাবে কি করে ? যে বন্ধু আমায় কথা দিয়েছিলো চাটগা অব্দি

যাবে আমার সঙ্গে, সে কথা রাখেনি। দু'জন না হলে হয়। তুই চল্ না আপা !

আগ্রহের সঙ্গে কথাটা বলেই সংশোধন করে নিয়েছিলো রানা— না, তোকে বলা বৃথা। তুইতোন আবার মা'র পয়লা নম্বরের চামচা।

নারে তুই আমায় একদম ভুল বুঝছিস।

মনের ভাব ভাইকে টের পেতে না দিয়ে রাকা আবার বল্লো, আমিও যেতে পারি। কিন্তু এমন কাঁচা পরিকল্পনায় নয়। বাবার পুরোপুরি ঠিকানা পেতে হবে। তাকে জানাতে হবে আমাদের আসার কথা।

সেটা তো কতো চেষ্টা করলাম কেউ বলতে পারছে না ঠিকানা।

তবে এক কাজ কর। বাবার এক ডজন পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রিন্ট কর। বিলেত বা বার্মিংহাম যারাই যায়, তাদের হাতে এক কপি ফটো পৌঁছে দে। যদি বাবার সঙ্গে কোথাও দেখা হয় তারা যেনো দয়া করে জানান।

চমৎকার ! দারুণ ! এন না হলে আর রানা ইয়াকুবের বোন রাকা ইয়াকুব।

তাহলে ঐ শর্ত রইলো। যা করবি আমায় জানিয়ে।

প্রমিজ। হাতে হাত মেলাও

রানাকে এভাবে পরিচালিত করতে পেরে মনে কিছু স্বস্তি পেলেও শান্ত হতে পারেনি রাকা। এসব ব্যাপার

মা আন্দাজ করতে পারলে আর রক্ষা নেই।

খাটের মাথায় পিঠ সাঁটিয়ে বসলো রাকা। ঘুমের চৌদ্দটা বেজেছে। আবার রানার ওপর রাগ হয়। মার ওপরও। একজন পাশের রুমে মজা করে ঘুমুচ্ছেন, আর একজন গেছে আরামবাগে সোনার হরিণ ধরার খোঁজে।

বিশ্রী বিবর্ণ এইসব সকালে ডালিয়াকে রাকার বার বার মনে পড়ে। গত বছরও এক ক্লাসে এক বঞ্চের বান্ধবী ছিলো। বাবার বদলীর জন্য এখন দিল্লীতে। 'ব্রোকেন ফ্যামিলি'র ট্র্যাজিডির খবর ওই প্রথম দিয়েছিলো। ওর মা, বাবাকে ফেলে আর একজনের সঙ্গে চলে গেছিলেন। সেই থেকে তালিয়া মা-ছাড়া। ক্লাসে একমাত্র রাকার সঙ্গে মন খুলে গল্প করতে পারতো। নয়তো মৌন বিষণ্ণ। পনেরো বছর বয়সেই রাকা নিজেও বুঝতে পেরেছিলো এসব কথা বাইরে জানাজানি হয়ে যাওয়া মানে অপরের তীব্র কৌতূহল এবং করুণার পাত্রে রূপান্তরিত হওয়া।

ডালিয়ার জীবনের উল্টো ঘটনা ঘটেছে ওদের দুই ভাই-বোনের বেলা। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখতে হয়েছে বাবার খামখেয়ালী চেহারা। হঠাৎ কোথায় যেনো হারিয়ে যান। মাসের

পর মাসও কখনো। তখন অভাব এবং নিদারুণ অসহায় অবস্থায় দিন যেতো তাদের। বাবা ব্যাংকে বেশ ভালো চাকরিই করতেন। সেটা খোয়ালেন অমনি গায়েব হয়ে হয়ে। এমন সময়ও গ্যাছে ধার না পেয়ে লাউ-কুমড়োর খাটা আর লাল আটার রুটি চিবিয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। মা চাকরি নিলেন এরপর। সেই অফিসে মার বস্ ছিলেন সায়ফুল মামা।

বাবার সঙ্গে কাগজপত্রে ছাড়া-ছাড়ি হবার পর এক দুপুরে মামা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এ বাসায় এসেন। জম্পেস খাওয়া জমলো চীনা হোটেল থেকে খাবার এনে। মা ওদের দু'জনকে আড়ালে ডেকে বল্লেন, এখন থেকে তোমাদের সায়ফুল মামা আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

বলার দরকার ছিলো না। সবই বোঝা হয়ে গেছিল। ক্লাসের কোনও কোনও মেয়ের মুখের আকারে-ইঙ্গিতে ! চোখের ইশারায়। এসব ব্যাপার কেমন করে যেনো সহপাঠী তো বটেই, আপাদের কানে পর্যন্ত চলে যায়।

মা ওঘরের মজলিসে ফিরে যাবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন রাখলেন, তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করতে পার।

রাকা নতমুখে মাথা নেড়েছে। রানা বোনের অনুকরণ করতে গিয়েও চট করে বলে ফেলেছে, মামা এখানে থাকলে বাবা কোথায় থাকবেন ?

সে কথা আমাদের জানার কথা নয়। সে যেখানে ভালো বুঝবে সেখানে থাকবে।

বাবার সঙ্গে তার পর দেখা হয়নি, এমন নয়। স্কুলের গেটের একদিকে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতেন। মায়ের চোখ বাঁচিয়ে কচিৎ কাছাকাছি হতে পারলে বলতেন, আমার জন্য তোমরা ভেব না। পড়াশোনা করো ঠিকমতো। আমার সময়ে আমি কিন্তু স্কুল ফাইনালে সারা দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম।

কথা বলার সময় বাবার চোখ রানার দিকেই বেশি থাকতো। ওর জন্য বেশি মমতা কিংবা শেষ পর্যন্ত নিজে যা পারেননি, ছেলে তা পারবে এমন কোনও লালিত বাসনা কাজ করতো হয়তো বা। রাকা ঠিক ধরতে পারে না। বাবার অভাববোধ রানার ভেতর যতোটা প্রবল, তার সম্ভবত ততোটা নয়। বাবাকে ভালোবাসার সঙ্গে রয়েছে তীক্ষ্ণ জীবন যাপন করলে আজকের বর্তমান অন্য রকম হতো। উড়ো কন্টে কাতর হতো না রানা। ক্লাসে স্বাভাবিক থাকতে পারতো সে নিজেও।

ভাবনার তার ছিড়লো। পাশের ঘর থেকে রোদেলা বারান্দায় মার ঘুমে জড়ানো কণ্ঠস্বর— চুনীর মা, চা দিয়ে যাও।

ধক ধক করছে রাকার বুক— কি হবে, রানা তো ফিরলো না এখনো ? ভয়ে সুরা পড়া ধরলো।

যদিও ছুটির সকাল মুখস্থ পদ্যের মতো। বেড-টি নিয়ে মা সরাসরি এ ঘরে আসবেন। দু'চারটা মামুলী কথা সেরে আদুরে ফুলের টবগুলো দেখতে যাবেন। নাস্তা হবে এক সঙ্গে। দু'একজন মেহমান আসবেন। মা, মামা তাদের সঙ্গে। ওরা দু'জন টিভির প্রভাতী অনুষ্ঠানে। কিন্তু আজ একটু পর যে ঝড় উঠবে----

রাকা শিউরে ওঠে। মাও ইদানীং কেমন হয়ে গেছেন। সামান্যতে রেগে যান। মায়ের হাতও হয়েছে রীতিমতো নিষ্ঠুর। বাবা যাবার পর রানারও যেনো খেয়ালের শেষ নেই। স্কুল কামাই করলো কিছু দিন। কিছুদিন ছাদের চিলেকোঠায় জনাকয় বন্ধু নিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে শুরু করলো নাচগান। জিজ্ঞেস করলে বলতো, আমরা ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলেরা মিলে একটা দল করছি।

দল করে কি করবি ?

বিটল গ্রুপের নাম শুনেছিস ?

নাঃ আমি তো তার জুনিয়ার কেমন করে শুনবো ?

টিজ করছিস কর। কিন্তু আমি ওদের গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। লণ্ডনের লিভারপুলের ব্রোকেন ফ্যামিলির চারটা ছেলে। বাবা মায়ের সংসারের নিত্যাদিনের অশান্তির জন্য ঘরে টিকতে পারেনি। মনের দুঃখে একসঙ্গে গান-বাজনা করতে করতে একদিন পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে গ্যালো। পিন্টু বলেছে আমরাও আমাদের কষ্ট এমনি করে জয় করবো।

রানা।

আমি জানি আপা আমার প্লান তোর পছন্দ হবে না।

এসব করলে পড়াশোনায় মন দিতে পারবি না।

ছেড়ে দেবো। পিন্টু বলেছে, সাধনার জন্য মেলা সময় দিতে হয়।

ঠিক আছে দিস্। কিন্তু এখন নয়। আগে একটু বড়োহ। যে গ্রুপের কথা বললি তারা কেউ তোদের মতো বাচ্চা ছেলে ছিলো না।

তাইতো! পিন্টু তো এদিকটা চিন্তা করে দেখেনি। আমিও না।

প্লিজ এখনো সময় আছে। সাবধান হ। মা জানতে পারলে--

যে ভয়টা ছিলো সেটাই ঘটলো। চুনীর মার কাছে সব শুনে মা মুখে খুব একচোট নিলেন রানার ওপর। বল্লেন, আর ওসব করবে না। বলো প্রমিজ।

রানা ঘাড় ত্যাড়া করে রেখেছে তো রেখেছেই। সেই ভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর জেদী গলায় জবাব দিলো, নো প্রমিজ।

তুমি কি জানো রান্না তুমি কি বলছো ?

মার কণ্ঠস্বর এবং চোখ সমান ঠাণ্ডা ছিলো। আর একটু হলে দেয়ালে টাঙ্গানো ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটাই হয়তো মুঠিতে নেমে আসতো। মামা এসে থামিয়েছিলেন—ছেলেমানুষের সঙ্গে তুমিও কি

ছেলেমানুষি শুরু করলে। এসব ব্যাপারে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ক্ষেপলে চলবে না।

ধৈর্য্যটৈর্য একজন আমার সব শেষ করে দিয়ে গেছে।

ও ঘরে মা কাঁদতেন। এঘরে রানা। রাকা কাঁদে না। ওর চোখে ঘুরে ফিরে বেড়ায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু ছবি। মা বেশ শান্ত ছিলেন। খেয়ালী বাবার নানা কর্মকাণ্ডে বদলাচ্ছিলেন দিনকে দিন। বাবা মাঝে মাঝে অফিস যেতে চাইতেন না। সারা সকাল কাটাতেন গান বাজনা করে। গলা খুব মিঠে ছিলো না। কিন্তু একনাগাড়ে গাইতে পারতেন অনেকক্ষণ। বিকেলে হয়তো প্রফুল্ল মুখে প্রস্তাব দিতেন, চলো জয়দেবপুর পার্কে ঘুরে আসি সবাই।

ওরা দুজন সমান উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠতো, কিসে করে যাবো। রিক্‌শা না স্কুটার।

ধ্যাৎ ওগুলো তো পুচকে। বিরাট বিরাট পাবলিক বাস রয়েছে না আমাদের জন্য। কখনো বলতেন, শাহজাহানপুরের মাঠে সার্কাস পার্টি এসেছে। চলো যাই দেখে আসি।

যাওয়া-টাওয়া শেষ পর্যন্ত কোথাও হতো না। বাগড়া দিতেন মা। মাকে ভিলেনের মতো লাগতো। মা একমুখে রেশনের কথা, বাজারের কথা আরও কিসব এক রাজ্যের সমস্যার কথা তুলতেন। যা ওদের একদম ভালো লাগতো না। ওদিকে বাবার মুখও চুপসে যেতো বেলুনের মতো।

আজকাল সেসব সমস্যা নেই। স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে না। টেবিলে ভালো স্বাদু খাবার। আলমারিতে আপটুডেট পোশাক। মামার অফিসের গাড়িতে ছুটির বিকেলে বেড়াতে যাওয়া। মা মামা যখন শাল মহুয়ার বনে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেন, ওরা দুজন তখন লেকের ঘাটলায় হয় চুপ করে বসে থাকে, নয়তো ফিরে ফিরে যে প্রসঙ্গে আসে সেটা বাবা সম্পর্কিত। বেশির ভাগ দিনই চুপ করে থাকে রাকা। ঐ নৈঃশব্দ রানাকে কখনো বিমর্ষ কখনো ক্ষেপিয়ে দেয়। গত শুক্রবার বিকেলেই বলেছিলো, জানিস আপা, আমায় না ভুল ঠিকানা দিয়ে ক্লাসের ছেলেরা মজা পায়। লণ্ডনে যাবার লোক যদি থাকে কমলাপুরে, ওরা বলে মতিঝিল।

রাকাকে চুপ করে থাকতে দেখে অভব্য ভঙ্গিতে চেঁচায়, তুইও মজা পাচ্ছিস নারে আপা।

রাকাও রেগে গেছিলো সেদিন— বাজে প্যাচাল রাখ। তুই নাচিস বলেই তো ওরা তোকে নাচায় বাবার জন্য এতো টানই বা ক্যানো? সে তোকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? খালি বাবা হলে হয় না বাবাদের কিছু দায়িত্ব থাকে।

বড়োদের মতো কথা বলছিস আপা !

বলি না। বলতে চাইও না। কে যেনো বলিয়ে নেয় আমায় দিয়ে। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয় আমার বয়স পনেরো না পঁচিশ।

একটু চুপ করে থেকে রানা আবার বলেছিলো, আমার একটা কথা শুনবি ভাই। শুনবি ?

জানি তো কি বলবি। এর ওর দরোজায় বাবার ছবি নিয়ে ছুটোছুটি করতে বারণ করবি তো।

করবো। কি লাভ হবে শেষ পর্যন্ত ?

ক্যানো আমি গিয়ে বাবাকে দেশে ফিরিয়ে আনবো।

বাবা আর ফিরবেন না। ফিরলেও আগের মতো একসঙ্গে বাস করার সুযোগ আর আমরা পাবো না। যে দিন যায় তা আর ফেরে নারে।

কে বললো ফেরে না। মা যদি বাবার বঙ্গে থাকতে না চায়, আমরা চলে যাবো বাবার কাছে।

আমি আমার বন্ধু ডালিয়ার কথা তোকে তো বলেছি। তাই তোকে বলি, একে ওকে বাবার ছবি দেবার ধান্ধা বাদ দিয়ে পড়াশোনাটা ভালো করে কর। রানা লক্ষ্মী ভাইটি —।

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রানা আচমকা প্রশ্ন করে বসেছিল—আচ্ছা আপা তুই বলিস মা-বাবা, মামা সবাই ভালো। সবাই যদি ভালো, আমাদের তবে এতে দুঃখ কেন ?

জানি না।

তুই তো অনেক কিছু জানিস। আজ ক্যানো জানিস নারে আপা !

জানি না। জানতে চাই না। তুই আমায় জিজ্ঞাস করবি না এসব।

দু'চোখ ভর্তি পানি নিয়ে রাকা সেদিন বলেছিল, সত্যি এগুলোর জবাব আমার জানা নেই। তুই তো তবু আমায় প্রশ্ন করিস। আমি কাকে প্রশ্ন করবো, বলতে পারিস ?

চুনীর মা ডাকতে এলো এ সময় ডিম-পরোটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

রানার শূন্য বিছানার দিকে চোখ যেতে বল্লো, ও মা আর একজন কৈ ?

রাকার মুখে কথা যোগালো না। এই প্রশ্নটাই মা যখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে করবেন কি জবাব দেবে সে? রানার-অদৃশ্য রানার ওপর অসম্ভব রাগ হতে লাগলো। জানে সবকিছু। তবু তাকে ক্যানো বিপদে ফেলা। এঘরে বসেও দিব্যি সে টের পাচ্ছে মুখটুক ধুয়ে মা বসেছেন ড্রেসিং টেবিলের ধারে। চুলে ব্রাশ, ঠোঁটে হালকা রহ। প্লাক করা ভুরুর মাঝে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা টিপ। প্রিয় পারফিউম স্যানেলের কয়েকটা ছিটাফোঁটাও সেই সঙ্গে। তারপর ঘুরে দাঁড়ানো। চার পা বড়োজোর ছ'পায়ের পর সোজা এই দরজায়—

মা আসার আগে পর্দা সরিয়ে ভেতরে এলো চুনীর মা। হাতে

একখণ্ড ময়লা কাগজ— একটা ছেলে তোমাকে এটা দিতে বললো।

সকাল থেকে বুকের তলায় নানা রকম শব্দ তরঙ্গ টের পাচ্ছিলো। সেগুলো একসঙ্গে যেনো দ্রুত লয়ে বাজতে লাগলো। কাঁপা হাতে কাগজটা নিয়ে কাঁপা গলাতেই রাকা বল্লো, তুমি যাও। মাকে বলো টেবিলে আসছি।

ভাঁজ ভাংতেই রানার হাতের অক্ষর। কোথায় দাঁড়িয়ে লিখেছে কে জানে। আঁকাবাঁকা , অস্পষ্ট লেখা—

মন্টিদের বাসায় যেতে হয়নি। রেল লাইনে দেখা পিন্টুর সঙ্গে। জানো তো ভারী ওস্তাদ ছেলে। বাবার একটা ছবি ও যেনো ওর কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়েছিলো। তিনি বার্মিংহামেরই বাসিন্দা। বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ওখানে ভারতীয়-পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদেরও নানা রকম হোটেল রয়েছে। বাবা নাকি তারই একটায় ম্যানেজারের কাজ নিয়ে গেছিলেন। পিন্টুর পড়াশোনা ভালো লাগে না। বিদেশ যাবার সখ। আর আমিও বাবার ঠিকানা পেয়ে দেরী করা ঠিক মনে করলাম না। তুই বাধা দিবি মাতো আছেনই। যে গাড়িটা কমলাপুর থেকে ছেড়েছিলো আমরা দুজন তাতে উঠে এসেছি। চাটগাঁ থেকে বিলেতগামী যে কোনও একটা জাহাজে উঠবো। পিন্টু বলেছে থাকা খাওয়ার কিছু অসুবিধা হবে না। ওখানে আলু-পেঁয়াজ কাটার জন্য আমাদের বয়সী ছেলেদের বেশ আদর। আমার জন্য ভাবিস না। ঠিক পৌঁছে যাবো। চিঠিও দেবো। শুধু বুঝতে পারছি না তোকে, মাকে ছেড়ে ওখানে আমার কেমন লাগবে---

কি ব্যাপার তোমাদের জন্য আর কতোক্ষণ আমরা অপেক্ষা করবো ?

একটু বিরক্ত মুখে মা দাঁড়িয়ে দরোজায় এপারে। রাকা কামিজের হাতায় চোখ মুছলো। নিঃশব্দে চিঠিসুদ্ধ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

মামা আমিরন

এখানে, নাসিরুদ্দিন সর্দার লেনের মুখ পার হতে গিয়ে প্রায়ই থমকে যাই। চলতি পতের রিকশার গতি থামে না। ইচ্ছে হলেও পারে না। পেছনে অগুন্তি চালকের তাড়া। সময়বিশেষে খিস্তি খেউড়। সড়কের ধারণক্ষমতার চেয়ে যানবাহনের সংখ্যা বেশি। সুতরাং টিমেতেতালায় হলেও চলার গতি সামনের দিকে। মন থেমে থাকে না। স্মৃতির পা উল্টো দিকে। চলতেই থাকে----।

যানজট শব্দটা প্রচলিত নয় তখন। রিকশা চলে দু একটা। রাজস্ব ঘোড়ার গাড়ির। অফিসপাড়ায় মোটর কার একেবারে হাতে গোনা। টাউন সার্ভিসের বাস পরীক্ষামূলকভাবে রাজপথের আনকোরা অতিথি।

শহরে জন্ম, শহরেই বসবাস, তবু রাস্তাঘাট ভীতি মামা আমিরনের একটু বাড়াবাড়ি রকমের। বাইরে আসার প্রয়োজনও তেমন পড়ে না। মোক্তার সাবের ফজলু মুহরী বাজার টাজার করে। সাবেরও সায় নেই বাড়ির বাইরে যাওয়া ব্যাপারে। বিবি সাবের হুকুমে মাঝে মধ্যে বেরুতে হয় লুকিয়ে।

জিন্দাবাহারের বড়ো পুকুরের ধারের প্রাচীন নিম গাছ তলায় ঠাঁই নিয়েছেন বাহাত্তরের এক কামেল ফকির। বয়স অতো কিন্তু দেখতে একদম যুবকের মতো। এমন রোগ নেই যা সারাতে পারেন না। কাউকে তালাবের পানি, কাউকে নিমের গোটা, কাউকে গোলারে আধফোঁটা কুঁড়িতে নিরাময় করেন। টাউন ভরে গেছে তাঁর সুনামের ঘ্রাণে। বিবি সাবের দুই মেয়ে হেনা-মিনা। ছেলে না হলে মুখরক্ষা হয় না সোয়ামীর কাছে। প্রায়ই তাই সিকিটা আধুলিটা দিয়ে পীরের খানকায় ঝিকে পাঠানো। আমিরনের ভালোই লাগে ওখানে বসে থাকতে। চেতনায় কোত্থেকে যেন এক ধরনের অচিন প্রশান্তি নামে। কিন্তু জেয়াদা দেরীর উপায় নেই। বাসায় রাজ্যের কাজ।

এই কাজের নমুনাগুলো এমন করে বাসা ভরে ছড়িয়ে থাকে, মনে হতে পারে কিছুক্ষণ আগে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। দুপুরে খাবার পর বিবিসাব চোখ মেলে রাখতে পারেন না। তাকে পেয়ে বসে ভাতঘুমে।। ছ'বছর আর চার বছরের দুই দুষ্ট মেয়ে ঘুমের ভান

করে থাকে। এক সময় উঠে শুরু করে দাপাদাপি। দুই শোবার ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা। কারু-কাজ করা কাঠের রেলিং। রেলিং-এর তলায় খোলা গোসলখানা। পাকা কূয়া। ওপাশে উঠান। বৈঠকখানা। চেয়ার, টেবিল, আলমারী, গোটা দুই বেঞ্চ নিয়ে মোক্তার সাবের অফিসঘর। আঙ্গিনার অন্য দিকে পাকঘর, খাবারঘর। শেষের কামরটা অবিশ্যি ব্যবহার হয় ভিন্ন কাজে। কাপাসিয়ার বিখ্যাত খান খানান পরিবারের মেয়ে বিবিসাব। আকাশ দেখা যায় এমন জায়গা স্নানের জন্য নাজায়েজ। ঘরটা তাই হামামখানা। পাথরের জলচৌকি, ঝকঝকে কাসার ঘটি-বদনা। র‍্যাকে কলকাতার বেঙ্গল কেমিক্যালের খোসবুদার চন্দন সাবান, আমলা তেল। ভেতরটা সারাক্ষণ ম ম করে ঐসব ঘোরানে।

নিষিদ্ধ ঐ এলাকায় মেয়ে দুটি ঐ সময় ঢুকে পড়ে তছনছ করে বেলোয়ারি সাবুনদান, ফটিকের আতরদান। খৈ-মুড়ি ছাড়িয়ে ডেকে আনে কাক চিলদের।

নিরাপদ দূরত্ব থেকে বাচ্চারা ওদের দেখে। বিবিসাব জেগে এসব দেখলে লড়াই আরও জমজমাট হয়। সেই আতংক বুকে করে আমিরন বাসায় ফেরে। নাঃ আজ ওরা বেশ শান্ত। বারান্দার চৌকিতে বসে হাতের সুতোয় টিল উঠানে ছুড়ে দিয়ে মাছ ধরা, মাছ ধরা খেলছে। কালো বোরখা রেলিং-এর রেখে আমিরন বলল, রাস্তায় আইজ একখান জ্যান্ত অজগর দেইখা আইলাম গো।

হেনা—মিনা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, আমরাও দেখব বুয়া।

না ছোনারা তোমাগো ছড়কে যাওন মানা।

কিসের কি মানা আমিরন।

বিবিসাব ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে আবার প্রশ্ন করেন, কাজ হল?

জ্বী বিবিসাব। হজুরে দিছে দাওয়াই। তয় কইছে জলদী কেরামতি দেখতে হইলে সিকিটায়, আধলিটায় কুলাইবোনা। ছাচ্চা চান্দির পুরা একখান টেকা লাগব। আমি বি কইয়া আইছি প'সার কমতি নাই আমগো মোক্তার সাবের।

আবার গেলে বলে এসো কাম হাসিলে রূপার টাকা নয়, সোনার মোহর দেবো। তাও যেই সেই মোহর নয়। খাস আকবরী মোহর।

বিবিসাব গো ঐ মোহরের নামই খালি হোনাইলেই, দেখাইলেন না চোক্ষের এক পলকবি। ছক লাগে দেখনের।

এসব কিমতি চিজ কি এই ভাড়াটে বাড়িতে রাখা যায় ? আমার আব্বাজানের লোহার সিন্দুকে আছে। একেবারে ভাগ বাটোয়ারা করা।

ভাগাভাগি করা ? কেলাগো বিবিছাব।

আব্বাজান হুজে গেলেন না এই বছর।

জ্বী হ কইছিলেন তো আপনে।

জানো তো এমন চমকদার কপাল হাজারে একজনের হয় কি না হয়। আগে আল্লাহ্ পরে রসুল। দুজনের মত একসঙ্গে হলেই বান্দার বরাতে জোটে ঐ রোশনাই। তো মক্কা মদিনা মেলা দুরের রাস্তা। কেউ ফেরে কেউ ফিরতেই পারে না।

কন কি লাছ বি ফিরে না ?

না। ঐ পাক মাটিতে যার ইন্তেকাল আর মাটিমঞ্জিল, জান্নাতুল ফেরদৌসের দরোজা তার জন্য একদম খোলা। দুনিয়াদারির শান শওকত তার কাছে ঝুটা। যাবার আগে আব্বাজান তাই সয়সম্পত্তি, জেয়র মহর যাকে যা দেবার দিয়ে গেছেন। আমার ভাগে পড়েছে দশটা মোহর। তা থেকে পীর হুজুরকে মন চাইলে একজোড়া দিয়ে দেব। তোমাকে দেবো বকশিস্ কোমরের রূপার বিছা।

তোবা তোবা। কন কি বিবিছাব। আমি বেওয়া মানু। বিছার ছোবা হারাম।

বিছার শোভা হারাম হবে ক্যানো ? নিকার বয়েস এখনো তোমার আছে।

কন কি ! বয়স হইলো দেড় কুড়ি দুই বছর। বুড়ি হইতে বাকি কি। আর একখানের জায়গায় দুইখান বিয়া মায়ালোকের হয় কেলা? পোলাপানের লাইগা। সোয়ামী থাকতেই পরমান হইছে আমি বাঞ্ছা আওরত। ফকিরী তদবির তাবিছ করাইতাছিলাম। পোড়া নসিব। দোলাই খালে শাবানের চান্দের জোয়ারের পানিতে ডুইবা মরলো মানুটা।

তোমার স্বামীর মৃগী রোগ ছিল না ? ওরা বেশির ভাগ ডুবেই মরে।

নাগো বিবিছাব হেই ছোট্টকাল থন পানির লগে কেলা জানি দুশমনি। একবার আমারেও ভাসায়া নিছিলো। বাইদানীরা বাঁচাইছিলো। হায় কপাল তখন যদি মরতাম, দুনিয়াদারির এতো নিমকহারামী দেখতে হইতো না। মায়ের প্যাটের বড় ভাই। বিধবা হওনের পর সোয়ামীর বাড়ি দোজখখানা। বাপের বাড়িও তাই। আস্তানা আর পাই না। হক জমিন লইয়া বেইমানী করতে চায় ভাই, ভাইবৌ। আইলাম মোক্তার সাবের কাছে। ভাইরে ডাইকা সমঝাইলেন। সেই থন আপনেরাই বাপমা। আপন গতর খাটায়া খাই। কেত্রৈর ধারধারি না। এ্যার বেস্তি আর কুছু চামু মাবুদের কাছে। আর—

বলতে বলতে থেমে যায়। যেতে হয়। বিবিসাবের গায়ের বরণ পাকা কলার খোসার মতো। চুলের রং লাল লাল। চোখের তারা একেবারে ফিরোজা। সেই চোখ নিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে যখন তাকিয়ে থাকেন, বুকের কোথায় কাঁপন ধরে। শীতল

চাউনির এমন গনগনে তেজ আর কারু চোখে সে দেখেনি। এবং ওটা ফোটে তিনি যখন গোপন রাগ পোষেণ বা বিরক্তিবোধ করেন। বেশী কথা শোনা তিনি যেমন পছন্দ করেন না; আমিরনও তেমনি থামতে পারে না কম কথায়। মূল প্রসঙ্গে চটজলটি পারে না কম কথায়। মূল প্রসঙ্গে চটজলদি ফিরে গিয়ে বলল, কোমরের বিছার বদলে একজোড়া মোহিনী মিলের কাপুড় দিয়েন। দিলে চাইলে পশমীর একখান চাদ্দইর।

বলে দাঁড়ায় না। সদরের শেকল কেউ নাড়ায়নি। তবু বলে, মুহরী ছাবে বুঝি আইলো। কপাট খুলতে গেলাম।

একগলা ঘোমটা টেনে আসে বৈঠকখানায়। টেবিল চেয়ার ঝাঝপোঁচ করে ফজলু মুহরী। মেঝে পরিস্কারের দায়িত্ব তার। ওদিকে কাকে চিলে একাকার করে রেখেছে কুয়াতলা। সেগুলো সাফসুতরা। হেনা-মিনার ফ্রক বদল। চুলে রিবনবাঁধা থেকে মুখ ধোয়ানো যাবতীয় কাজ। বিবিসাবের বাপের ঘরে এসব করার রেওয়াজ নেই। সব করে দাসী-বাঁদীরা। মোক্তার সাবের সে মুরোদ কৈ। বান্দীও আমিরন, দাসীও আমিরন।

মুফতে কাম তো মেলা লইতাছেন। মগর ঝামটাঝুমটাগুলি জেয়াদা কম করবার পারেন না। দেমাগ আছে তুমার বাপের বাড়িত। খসম তো দস-বিশ প'ছার মুক্তার। মানুটা ছাচ্চা ছোনার, ছাও দুইটার উপরে মুহাববতবি লাইগা গেছে বইলাই না টিকা রইছি। নাইলে কবে মরার মামাগিরির কপালে পাঁচ পয়জার মাইরা গায়েব হইয়া যাইতাম।

স্বগতোক্তির শেষের লাইনটা একটু জোরেই উচ্চারিত হয়েছিল। দ্রুত চকিত চাউনিতে চারপাশ জরিত করে নিশ্চিন্ত হলো। টানটান করে চুল বেঁধে, রংদার ভাগলপুরী জংলি শাড়ি পরে, মুখে হিমানী মেখে মই বেয়ে দেয়ালে উঠছে বিবিসাব। পাশের বাসাটা পেশকার সাবের। মাঝে দেড় মানুষ সমান দেয়াল। দু দেয়ালের দুদিক থেকে রোজ বিকেলে একজোড়া মই লাগে। দুদিক থেকে দু বিবিসাব চংগার মাথার উঠে রাজ্যের গল্প শুরু করেন।রাস্তার ধারে বাড়ি বলে দিমেমানে পর্দানশীল কোনও বৌ আসতে পারে না। এবাড়ি বিবিসাবও যেতে পারে না একই কারণে।

পাকঘরের র‍্যাকে ধোয়া বাসন সিজিলমিছিল করে রাখতে রাখতে আমিরন কান খাড়া করে রাখে। খানিক বাদে মুখ বাঁকায় মরার জ্বালা আবার লড়াই ফ্যাসাদের তুবড়ি। সোয়ামী পীরিতের বাতচিত না, ইসলামপুরার নয়া গয়নাগাটি, পাটুয়াটুলির অমৃত বস্ত্রালয়ে, মেঘদূত জর্জেট শাড়ি। মুকুল, রূপমহল হলের হালের বায়েস্কোপ, নিদানপক্ষে মিঠাইওয়ালাদের নয়া মিঠাইর নাম নিশানার কথাবার্তাও নেই। আছে সাত সমুদ্রের দেশে দেশে কাফের ইংরাজদের যুদ্ধের খবর। দুমদুম করে নাকি আসমান থেকে বোমা

পড়ছে। মানুষ মরছে কাতারে কাতারে। ইয়া নফসী, ইয়া নফসী, রব উঠেছে সাদাসাবদের ঘরে-বাইরে। জাপানীদের গোলায় দারিয়া যতো মালের জাহাজ ডুবছে, বাজারের চাল, চিনি আটা, ময়দা, এমনকি মাছ তরকারির দাম আক্রো থেকে আক্রা হচ্ছে। এইসব নীরস কহানী আড়ি পেতে শোনার মধ্যে মজার বদলে আছে ডরভয়।

বিবিসাবদের বিকালের আসর আজ জমতে পারলো না। চারদিক কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠলো- হো হো হো ছাদকা ওপর আদমী উঠতা— হো হো জানানালোগ ছুপাকে যানা.. ছাদকা ওপর আদমী উঠতা ---হো ---হো..

ঘাটের মরাগুলো ছাদে ওঠার আর সময় পেলো না।

গালমন্দ করতে করতে মই থেকে নামছেন বিবিসাব। কাছাকাছির কোনও ছাদে প্রয়োজনে পুরুষরা উঠছে। স্ত্রীলোকদের জন্য তাই এ সতর্কতা।

ততোক্ষণে আসরের আজান পড়েছে। নামাজীরা ছাড়াও চিপাগলি পরিসরে নেমেছে ছোট ছেলেমেয়ের দল। খেলার জন্য। সৌখিন কেনাকাটার জন্য। নানা কিসিমের ফেরিওয়ালাদের ডাকে গমগমে চারদিক। বুড়ীর মাথার পাক্কাচুল.... লাল মিঠাই...

বেলুন নেও গো বেলুন।

কাগজের খেলনা। কাঠের খেলনা। যা যা নিবা এক পয়সা।

কুলপি মলাই, খাঁটি কুলপি মলাই.....

বোরখা বা চাদরে শরীর ঢেকে বাড়ির ভেতরে ঢোকে মটরওয়ালী, মেশীওয়ালী, ঘুগনীওয়ালী। ক্রেতা ঘরের বৌঝিরা। পয়সা লাগে না। চাল দিলেই চলে। মোক্তার বাড়িতে এসব ঢোকা নিষেধ। মায়ের চোখ বাঁচিয়ে হেনা— মিনা ফ্রকের কোঁচড়ে করে চাল পাচার করে। সাবধানে তা দিয়ে এক এক দিন এক এক রকম খাবার কিনে দেয় আমিরন। কাগজের ঠোঙ্গা লুকিয়ে ওরা বাইরের রোয়াকে চলে আসে অফিস ফেরত বাবাকে দেখার উছিলায়।

ওদিকে গলি গরমকরা ফেরিওয়ালাদের হাকাহাকির ভেতর ফুরিয়ে আসা হেমন্তে ছোট হয়ে আসা বেলা। কাঁধে মৈ, হাতে কেরোসিনের ছোট টিন নিয়ে বাইরে থেকে মহল্লায় ঢোকে বাতিওয়ালা। মোড়ে মোড়ে কাঠের খুঁটির মাথায় চৌকোন বাতিদান। চঙ্গা লাগিয়ে ওপরে উঠে চিমনী মুছে, তেল ভরে দেশলাইএ সলতা জেলে নেমে পড়ে। দানাবাধা গোধূলির আধ আঁধারে ও যেনো এক রহস্যজনক মানুষ। মসজিদের মিনারে ততোক্ষণে গমগম করে মাগরেবের আজান। সেই সঙ্গে যেনো যন্ত্রের মতো বদলী চলে ফেরিওয়ালাদের হাকডাকের—চাই বেলফুলের মালা.....

গরমাগরম ভুনা কাবাব.....

ফালুদা, দিল ঠণ্ডা শাহী ঘোলে ফালুদা---------

এই যে ফালুদা। কাঁচা বরফ আছে তোমার কাছে ?

বৈঠকখানা থেকে রোয়াকে দাঁড়ায় ফজলু মুহরী। আনাড়ি এক মক্কেল সদরঘাটের গয়না নৌকা থেকে নেমেই নগদ টাকা-পয়সা বুঝিয়ে এসেছে পকেটমারের হাতে। কেঁদেকেটে হয়রান। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি তার জন্য জরুরী। শুনেও ফালুদাওয়ালা কানে নেয় না। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দেয় শুধু, কাচ্চা বরফ পাইবেন হরবত ওয়ালাগো কাছে। গল্লির মাথায় অগো দুকান। আমি বেচি শাহী ফালুদা।

তুই ব্যাটা যন্তো খানদানী মালই বেচিস না ক্যানো, আমারে দোকান চিনাস কোন সাহসে। দশ বছর এই গলিতে। তুই বরফ দিতে পারবি না তাই বল।

খবরদার। তুইতুকারি করবেন না মিয়া। বালা আইবো না আপনে আইনের কারবারি। আমি ফালুদার কারবারি। দুই কারবারিতে তুইতুকারি কেনা ? এ্যা ... কইলেন তো দহ বছর। আর জানেন না এই পাড়ায় থাকতে হইলে, বাইরে ধন যারা আছে তাগো মোক ছামাল দিয়া, আদবকায়দামাফিক ছুই সালামতে চলন বলন লাগে... এ্যা....

কথা কাটাকাটির শব্দে স্বয়ং মোক্তার সাহেব বেরিয়ে আসেন। মিষ্টি কথায় ছোকরা ফালুদাওয়ালাকে বিদায় করেন। হাল্কা বিরক্তি রাখেন মুহরীর জন্য-- আপনাকে কদ্দিন বলেছি এরা হলো স্থানীয়জন, মহল্লার মানুষ। আমরা বাইরের লোক। গ্রামগঞ্জে থেকে আসা। এদের সঙ্গে লাগা মানে নিজেদেরই মুস্কিল ডেকে আনা। যান ভেতরে গিয়ে আমিরনের কাছ থেকে একগ্লাস চিনির সরবত করে নিয়ে আসুন।

এক নয় আমিরন তৈরি করে দুগ্লাস সরবত। পর্দার আড়াল থেকে একটি এগিয়ে দেয় ফজলু মুহরীর দিকে। দ্রুত সেটা গলায় ঢেলে নিয়ে খুশীতেডোবা আবেগে মুহরী বলল, তুমি আছ বলেই এ বাড়ীতে কাজ করে সুখ। আহা কি হাতের গঠন তোমার আমিরন। দেখাইবা আর এক বার।

আড়ালে জিভ কাটে আমিরন—অমুন কথা কইবেন না মিয়াভাই। আমি রাঢ়ি মানু। ঐ হগল শুনলেও পুনা হয়। আপনে বড় ভাইয়ের লাগান। আছি একখানে তাই একজারাসা খেদমত করা আর কি।

আচ্ছা বহিন আর বলবো না ঐ ধারার কথা। চলি।

ফজলু মুহরী চলে যেতেই পাকঘর থেকে বেরিয়ে আসে আমিরন। বড় ঘরের দরোজার কাছে এসে বলে, বিবিছাব তরকারি-উরকারী বেবাক গরম কইরা সারছি। চাইল দিমু কয় পট? রোজকার মতন ?

না আমাকে বাদ দিয়ে।

আল্লারে বুখার-উখার আইছে নিকি ?

তোমার যতো লক্ষ্মীছাড়া কথা।

তয় কি রান্ধন খরাব, বেসোয়াদের অইছিলো।

না তাও নয়। তোমাদের সাহেব যা বাজার করায়, রোজ রোজ ঐ ট্যাংরা পাপদা দিয়ে ভাত আমার মুখে রোচে না।

যার যেমুন ক্ষেমতা। কি করবেন বিবিছাব।

আমিরনের গলায় সহানভূতি। চোখে আতংক। হয়তো এখনি মনিব চিৎকার করে উঠবেন চাকরানীর বেয়াদবিতে। কিন্তু কি যেনো হয়েছে আর সন্ধ্যায় বিবিসাহেবের। ধমক দিলেন না। জানলার দিকে মুখ করে ছিলেন, তেমনি থেকে অচিন উদাস সুরে বললেন, খান খানান্ বাড়ির মেয়েরা রাতে পাকাখানা খায়।

হ, তা আর জানি না। আমগো হুর্দার বাড়িতেও হর রাইতে পুলাও কুর্মার ইন্তেজাম থাকে। কি করবেন। মায়ালোকের তকদীর বইলা কথা। সোয়ামীই বেহেস্ত সোয়ামীই দোজখ।

এই বেহেস্ত দোজখ মানুষের বানানো। আর সে মানুষ হচ্ছে আমার ধাপ্পাবাজ মামুজান। ইংরেজের গোলামদের হাতে খানখানান বাড়ির কোনও মেয়ে কোনদিন পড়েনি। আব্বাজানের মগজ ধোলাই করে মামুজান বোঝালেন উকিল মোক্তার বৃটিশের নফরচাকর নয়। স্বাধীন আইন ব্যবসায়ী। মোক্তার জামাই পেলে মামুজানের ফৌজদারী মামলা বিনা পয়সায় চলবে, এই স্বার্থ আব্বাজান বুঝলেন না। আমায় সপে দিলেন বটতালার মোক্তারের হাতে। পাপ করেলন বাপ। প্রায়শ্চিত্ত করছে বেটি।

তো বিবিছাব আপনের যখন অতই না পছন্দ দুলা, তখন বালবাচ্চা পয়দা হইবার আগে—

খরবদার আমিরন। তালাক-ফালাকের নাম নিবে না। আল্লাহ মালিকের পাক আরশ থরথর করে কাঁপে ঐ শব্দটায়।

তয় আর মানগুমান কেলা, মাইনা লন বরাতরে। সাব আমগো ছোনার মানু। প'ছা না থাউক দিন্ আছে। এমুন মুহাববতের খছম কয়জনে পায়।

বলেই কেটে পড়তে হয়। চোখ দিয়ে তাড়া করেছেন বিবিসাব। এতোটা এগুনো তারও উচিত হয়নি।

একপেট খিদে নিয়ে বারান্দার চৌকিতে বসে আছে হেনা-মিনা। ওদের দুধভাত খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে মনিবদের খানাপিনার ব্যবস্থা। বুকের তলায় কাঁপুনি টের পাচ্ছে। বিবিসাব সেদিন রাতের খাবার নিয়ে বিদ্রোহ করে, বিশ্রী অবস্থা হয় বাড়ির। মায়ের রুক্ষ হৃদয়হীন অভিযোগের শব্দে ঘুমন্ত বাচ্চারা জেগে কান্না জুড়ে দেয় ভয়ে। সাহেবও একসময় ঠাণ্ডা থেকে গরম হয়ে ওঠেন। ভদ্রলোক বলে অবাধ্য স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন না। কিন্তু বেরিয়ে যান ঘর

থেকে। সেইসব রাতে সাহেবকে নিয়ে খুব ভাবনা হয়। ভালো মানুষ, খারাপ জায়গায় যাবেন না নিশ্চয়। ঘুরবেন পথে পথে। যুদ্ধের বাজারে গুণ্ডা লুটেরার সংখ্যা বাড়ছে দিনকে দিন। তাছাড়া বিবিসাবের কাছে আর এক ধরনের দুশমনের কথা সে শুনেছে। মামলা মকদ্দমায় হেরে যাওয়া কিছু বেজাহানী মানুষ আছে, যারা শাসায় প্রতিশোধ নেবে বলে। সাহেব যদিও পাত্তা দেন না। হেসে বলেন, বেহদা ভাবনা তোমাদের। ওরা একশ্রেণীর সাময়িক পাগোল। এটা তো আমার পেশা। রাগ দুঃখের মধ্যে কথাটা ভুলে গেলেও পরে ঠিকই বুঝতে পারে। নাইলে দেওয়ানী ফৌজদারী আদালতে উকিল মোক্তার বলে কোন প্রাণী থাকতো না।

হেনা-মিনা ঘুমোনর পর চৌকিতে খাবার সাজায়। কপাল ভালো, আজ কোন মক্কেল যেনো একখাচি বাকরকানি সুতলী কাবাব দিয়ে গেছে। বিবিসাব খুশি খুশি মুখে কথাবার্তা বলছেন। আজকাল নিজের ভাগ সে বাড়ি নেয় না। কে আছে খাবার বাড়তি মুখ। ভাই-এর একটা বাচ্চা তার বাধ্য ছিলো। মাঝে মাঝে দেয়াল খাড়া করে তার আসটা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই এখানেই খেয়ে বাড়ির জন্য বের যখন হয়, তখন মসজিদ থেকে এশার শেষ নামাজীও ফিরে গেছেন। প্রায় সুনসান মহল্লা । জি ঘোষের পেটা ঘড়ি থেকে টুংটাং শব্দ। গুণে গুণে দশবার। মনিববাড়ি থেকে নিজের ডেরার দুরত্ব এমন কিছু নয়। তার মধ্যে দেখা হয়ে যায় উঠতি বয়সের দু একটি ছোকরা মাতালের সঙ্গে। রাত বলে বোরখায় নয়, শরীর ঢেকে নেয় চাদরে শুধু। নেশার ঘোরে যারা চিনতে পারে না, দাঁড়িয়ে যায়। কান অবধি টানা হাসি দিয়ে শুধায়,কে সুবাসী, ইতনা রাতমে... কেডা গো...

আমিরনও দাঁড়ায়। দুহাত কোমরে তুলে বলে, আমি তো আমিরন বেওয়া। তুই কেউগা ? রহিমের পুত ছাইজু না।

ছাইজু না ছাইজু না। বাপে আকিকায় মেলা পছা খর্চা কইরা নাম রাখছে ছাজাহান।

আকিকার কথা মনে আছে, মোছলমানীর কথা মনে নাই। মোটে দুই বসসর তর মোছলমানী হইলোরে। চকচকা একখান চাইর আনি দিয়া আইছিলাম তর খতনা পরবে। আর আইজ তুই আমারে ডাকতাছত সুবাসী কইয়া ?

চিনছি। মাপ কইরা দিয়ো গো ফুপু।

মাপের কথা বাদমে। আগে ক বাংলা মদ গিলছত কিতনা। আমাগো দোলাই খালে যিতনা পানি আছে উতনা ?

নাগো ফুপু। এই একজেরাসি। তা বি ছালা কাছুর পাল্লায় পইরা, কছম খোদার। এই ছুরু এই খতম।

খতম তারাবি তুই কি কবি। আমিই তরে ঐটা পরামু।

কছম লাগে, আমার বাপেরে কইয়ো না।

২

বাপেরে কমুনা। মগর বাপের বাপেরে কমু।

মাইনে আম মজলিসে ?

হ ! কাইল ফজরে কামে যাওয়ানের আগে যামু হুর্দার বাড়িতে। ইতনা বড়া হিম্মত তর, মহল্লারে বানাইছত মাতলামির জাগা! জানছ না নেসা কইরা পাড়ায় ঘুছলে পাক মজিদে ছালিস বহে।

দোহাই আল্লার। অমুন আজাবে আমারে ফালাও না। হুগগলের ছামনে নাক কান মলবার পারুম না।

তাইলে এই পাক মজিদের ইটা ছুইয়া কসম খা, আর করবি না এমুন জাহান্নামী আকাম কুকাম।

মজিদ না। মজিদ না। তোমারে ছুই।

আমারে কেলা ?

গোসসা মাৎ করো। নাপাক মানু আমি। বেপাড়া থন আইছি। মজিদে হাত দিলে হাত জ্বইলা খাক হইয়া যাইবোনা।

ঠিক আছে। মৌলবী ছাবেগো মোকে ছুনছি,আদমীর মোক হরহামেশা পাক থাকে। মজিদের দিকে কল্লা ফিরায়া ছাত ছাত বার কছম খা।

সাইজুকে মসজিদের বন্ধ দুয়ারের রেলিং—এর বাইরে নতজানু করে বসিয়ে দিয়ে আমিরন কানাগলিতে ঢোকে। মাটির দেয়ালের টিনের চালের ঘর। এক চিলতে 'ওসারা'। পাড়ার এক বুড়িকে শুতে দেয় ওখানে। মেঝের বিছানা সকলে তোলার সময় পায় না। রাতেই সারে নিজের ঘরের কাজ। মালদার জিনিস বলতে ছোট একটা সিংগারদান। মানুষটা মরার আগে কাঠপট্টি থেকে শখ করে কিনে এনেছিলো। কুপির আলোয় নকশীদার আয়নায় চেহারা দেখে। দেখে হতাশ হয়। নাঃ বয়স হল দেড় কুড়ি। তবু না হল চুলের রং বদল, না ভাংলো চাপা। অথচ তার বয়সী ভাইবৌ বা সই লাহোরার চুল পেকে, গাল ভেঙ্গে একাকার। সোয়ামী না থাকলে শরীরের ক্ষয়ক্ষতি দেরিতে হয়। তিন মাথার বুড়িদের কথাটা গোদে। থাকবে কি করে? মৃগী রোগের ফর্সা একহারা দেহের সেই মানুষটা। দেখলেই মনে হত জোরবল কিছু নেই। রোগ মাথাচড়া দিলে ওর ভাইরা দুদিক থেকে হাত পা ধরে শুন্যে তুলে দড়ি পাকানোর মত ওলটপালট করত। মুখে ফেলা উঠত। পড়ে থাকত জিন্দালাশের মত। স্বস্থ বোধ করলে প্রায়ই বলতো, মানষে তরে বাঞ্জা কয় আদতে তুই না, আমি। মিরগীর বেরামীরা বাঁচে না বেস্তি রোজ। মরলে কেঐর বাত কানে লবি না। নিকা কইরা ছাও পয়দা করবি।

যাই যাই কইরা হাচাই গেল যখন, বয়স তখন এককুড়ি সাত। ছোচলাম বুড়া হইতে আর বাকি কি। পুলাপানের খায়েছ মিটল মুক্তার সাবের দুই বেটি গোদে কাখে কইরা। মগর অখনও দাত

পড়ে না, চুলবি পাকে না। মতাল পোনারা ভুল কইরা হইলেও ডাকে সুবাসী কইয়া। করি কি আমি? পুতা দিয়া দাত ভাংগুম? না, ঘি মাখায়া চুল সফেদ করুম?

চৌকা আয়নায় নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কুপি নিবিয়া দিয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়। না : নিশিরাতে আর আয়নায় চেহারা দেখবে না। তিন মাথার বুড়িদের কথাই ঠিক। বেওয়া মানুষের ভরাযামে মুখ দেখতে নাই। আপন শরীর দুশমনি শুরু করে। সারা অঙ্গ আপনা আপনি গরম হয়ে বুকের তলায় উথাল পাথাল ঢেউ যন্ত্রণার। এমন গুনার কাজ আর সে করবে না। স্বয়ং শয়তান খাড়া এখন তার সামনে। দেহভরে কামনা জাগিয়ে দিয়ে, ঘুম কেড়ে নিয়ে বিদ্রোহী আজাজিল মজা দেখে অসহায় আদম সন্তানের। সেও উচিত তামাশা দেখাবে ওকে। সিংগারদানের আয়নায় কালো কাপড়ের নেকাব পরিয়ে রাখবে কাল থেকে।

ঘোষ বাড়ির ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজে। বহুদিন পর আজ বুঝি বিবিসাবের নিকা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেছে সোয়ামীর মুখ। ঘুম দানা বাঁধে না।

ফজরের নামাজ পড়ে বেরুতে যাবে, সই লাহোরার ছেলে নিয়ে এলো এক বাটি মিষ্টি। লাহোরার বেয়াই বাড়ির উপহার। বোরখার তলায় সেটি নিয়ে রওনা দিল আমরিন। কদিন থেকে হেনা-মিনা মিঠাই খাবে খাবে করছিলো। বিবিসাব দেখলে অবিশ্যি খেতে দেবেন না। লুকিয়ে খাওয়াতে হবে।

রাত জাগা কিংবা যে কারণেই হোক মাথা ঝিমঝিম করছিলো। সকালেই ঘটে গেলো এক অঘটন। কুয়ো থেকে পানি বুলতে গিয়ে বলতি পড়ে গেলো। নয়া দড়ির কথা মুহরী সাবকে মেলা দিন বলা হয়েছে। আনা হয়নি। আমিরন গালে হাত দিয়ে বসলো, এখন উপায়। ক্ষয়া রশি ছিড়লো, কাজ হবে কি করে? এক সংসার মানুষের পানি কি কম লাগে? সাবের আবার ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে দশটায় অফিস যাওয়া।

কুয়ায় ডোবা বালতি ঘটি তোলা লোকেরা ডাকাডাকি করবে দুপুরে। শিল-পাটা খোটা, বটিধার, সৌখিন বেলোয়ারী সামগ্রীর ফেরীঅলারা-ওরা সবাই আসবে দুপুরের দিকে। দুপুর এখনো অনেক দূরে। সবে রোদ চাল থেকে ছড়াতে শুরু করেছে গলি পথে।

হেনা-মিনা উঠে গেছে এরই মধ্যে। ওদের দুধ নাস্তা খাওয়ানোর পর সাব বিবিসাব ওঠেন। আজ দুবোনের সামনে সই-এর পাঠানো মিষ্টি, দুবাটি দুধ ধারে দিয়ে বলল, আমি একজেরাসা কামে গেলাম। ছোনার টুকরারা খাও। আমি যামু আর আমু।

হেনা বল্লো, ক্যানো যাও?

কুয়ার কাঁটা লয়া আহি সই এর বাড়ির থন। বালতি তোলন

লাগবো।

আমরা রেলিং-এ হেট্ ঘোড়া হেট্ ঘোড়া খেলবো।

না না যাদুরা, আমি আহনের পরে খেইলো। অখন মিঠাই চাইরখান খায়া দুধ খাও। ফিরা আইয়া গরম গরম ডাইলপুরী বানাইয়া দিমুনে ছোনারা।

সদরের শিকল বাইরে থেকে আটকে দিয়ে জোরকদম চালালো সই-এর বাড়ির দিকে। বড়ো ভাই -এর ঘরে আছে কাঁটা। মাথা কুটলেও দেবে না। সই-এর ঘর একটু দূরে গলির এ মাথা থেকে ও মাথা কি যাবে? জোরে পা চালাতে গিয়ে শুনতে হলো নামাজী বুড়োদের কড়া ফাতোয়া-জেনানাগো শরমভরম দিনকে দিন উইঠা যাইতেছে। কেয়ামতের আলামত। পারে তো আয়া মরদের গর্দানে পড়ে। আগো কেঠা তুমি। এমুন নাজায়েজী চালচলন---

একথা সেকথা দুপাশে শুনতে শুনতে ছোটে। ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। দেখে সদরের শিকল খোলা। অঙ্গিনা ভর্তি বাচ্চাবুড়ার হৈ চৈ। মিনা কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে। ওকে কোলে করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে মোক্তার সাব।

ফজলু মুহরী হাকডাক করে কাদের নামাচ্ছে কুয়ার ভেতর।

বুকটা ধরক্ করে ওঠে। শোবার ঘরে চৌকাঠের আড়ালে চুল চিড়ে বিলাপ করছেন বিবিসাব। আমিরনকে কাছে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো দুহাতের ধারালো নখ নিয়ে—তুই রাক্ষুসী আমার মেয়ে খেয়েছিস। তোকে আমি খাবো।

মোক্তার সাব ছুটে না এলে কি যে হতো। দিশেহারা অমিরনের বুঝতে কিছু সময় নিলো। সে চলে যাবার পর দুবোন রেলিং-এ উঠে ঘোড়া ঘোড়া খেলছিল। কাঠের রেলিং-এর নাটবল্টু কবে নড়বড়ে হয়েছিলো কোন দিকের কেউ খেয়াল করেনি। জোর ঝাকানিতে একটুকরো রেলিংসহ হেনা ছিটকে পড়ে গেছিল কুয়ার ভেতর। মিনার কান্নায় ঘুমন্ত বাবা মা যখন জেগেছে, কুয়ার পানি তখন একেবারে সমান।

কে একজন আমিরনের হাত থেকে কাঁটা নিয়ে নামিয়ে দিলো নিচের দিকে। যে যুবক দুটি নেমেছিলো, তারা উঠলো হেনার মৃতদেহ নিয়ে। নিথর সেই শিশুমুখ দেখে বোরখা হাতে আমিরন সেই যে বেরুলো আর ফিরলো না।

হেনার অকাল মৃত্যু রাতারাতি আমিরনের মাথার চুলে নামিয়ে দিলো সাদা রং। আর দিলো আত্মঘাতী অন্ধ সিদ্ধান্তে—মামাগিরি আর নয়।

প্রথম দিকে কেউ দিলে খেতো। না দিলে উপবাসে কাটাতো। তারপর বিক্রি করলো স্বামী-সোহাগের চিহ্ন সিংগারদান। এরপর আপন ঘরে ভাড়াটে বসিয়ে নিজে থাকতো 'ওসারায়'। শুয়ে বসে কাটিয়ে একসময় চলার শক্তি কমে এলো। কথা বলতো না। বললে

একটা লাইন শুধু -পানির লগে আমার দুশমনি নাই। কুনু দুশমনি। তাও কেলা জানি হর ওয়াক্ত পানি আমার লগে দুশমনি পাতায়। কেলা? ক্যাও কইবার পার?

পৃথিবীর মেলা কার্যকারণ বুদ্ধির বাইরে। মামা আমিরনের মৃত্যুটাও যেন তেমনি। সেও মরলো পানিতে। দোলাই খালে নয়, বাড়ির পাতকুয়ায় নয়, ঘরের ওসারায়।

ঢাকা শহরের বন্যার পানি প্রথম প্রবেশ করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। বুড়িগঙ্গার পানি সেবারে লাফাতে লাফাতে উঠে আসে অলিগলি, রাজপথে। দোলাই খালের গা ঘেঁষে নাসিরুদ্দিন সর্দার লেন। বন্যার পানির খলবলে একটা অহংকারী রূপ আছে। দমে দমে নাচে। নাচতে নাচতে চলে আসে গেরস্থের আঙ্গিনা, বারান্দা, ঘরে। ভাড়াটেরা আমিরনকে বলেছিলো ভেতরে এসে শুতে। আমিরন রাজি হয়নি। রোগা হাড় বেরকরা শরীর আধভেজা হয়ে পড়েছিলো বারান্দায়। কৃষ্ণপক্ষের জোয়ারে সন্ধ্যা থেকেই পানি বাড়ছিলো। স্রোত নয় যেন নাগিনীর আগুনে ফণা। ছোবলটা কখন এসেছিলো কেউ টের পায়নি। সকালবেলা দেখা গেলো ওসারা ছেড়ে উঠোনে ভাসছে আমিরনের লাশ। চোখ বোজা। খোলা শুধু দুটি ঠোঁট। তেমনি ভঙ্গিতে যে ভঙ্গিতে সে একে তাকে কেবলি প্রশ্ন করতো, পানির লগে আমার দুশমনি নাই। তাও কেলা হর ওয়াক্ত পানি আমার লগে দুশমনি পাতায়। কেলা ? ক্যাও কইবার পার ?

গতি মুখ

খবর পেয়ে ক্লাব থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো রেজ্জাক। ফ্যাসির মুখ নয়, আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক মমির মুখ যেন তার সামনে। দোর গোড়ায় স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দুহাতের মধ্যে কপাল চেপে বেগম তাহমিনা বসেছিলেন একটা বিধ্বস্তপ্রায় মূর্তির মতো। কাঁদছিলেন ? পায়ের শব্দে মুখ ফেরালে বোঝা গেল, না। কিন্তু চোখদুটো লাল টক্‌টকে। রেজ্জাকের উপস্থিতি সেই চোখে নিরীক্ষণ করলেন। তলিয়ে গেলেন আবার নিজের মধ্যে।

রেজ্জাক পা পা করে এগুলো খাটের দিকে। ফ্যানসির জ্ঞান নেই, কিন্তু বেঁচে আছে বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার আর নার্সদের ব্যস্ততায়, কর্মতৎপরতায়।

একসময় ডাক্তার খান তাকে ডেকে নিয়ে এলেন ব্যালকনির ধারে। প্রায় রুক্ষ চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

ক্লাবে।

আর আপনার স্ত্রী ?

সম্ভবত মিঃ আহাম্মদের সঙ্গে।

আপনি কেন সঙ্গে ছিলেন না।

আমি....

বিহ্বলতা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করলো রেজ্জাক— আমি, আমি কেন থাকবো ? ওরা দু'জন বেড়াতে যাচ্ছিলো, আমি হোতাম তৃতীয় অনাহূত ব্যক্তি মাত্র।

ডাক্তার যেন ব্যঙ্গ করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে— উপেক্ষাটুকু অসহ্য মনে হচ্ছিলো অথচ আপনি তার স্বামী, তার প্রতি আপনার একটা কর্তব্য ছিলো সে কথাটা আপনার মনে হয়নি? আশ্চর্য আপনাদের আত্মসম্মানবোধ।

প্রবীণ চিকিৎসক যেন তাঁর অধীনস্থ অপরাধী কোনও ছাত্রকে তিরস্কার করে ফিরে গেলেন। রেজ্জাকের ভালো লাগেনি। অথচ প্রতিবাদ করার মতো অবস্থাও নয় তখন। বরং ডাক্তারের শেষের কথাগুলি তার মনে আলোড়ন আনছিলো। সন্দেহ হচ্ছিলো, জ্ঞানহীন ফ্যান্সির মুখ থেকে কিংবা বেগম তহমিনার অবরুদ্ধ

আবেগ থেকে অসর্তক কোনও মুহূর্তে কি প্রকাশ পেয়েছে তেমন কোনও সূত্র, যা থেকে একজন অচেনা পদস্থ সামরিক অফিসারকে অমনি করে বলতে এতটুকু বাধেনি ডাক্তার খানের ?

এই সংশয় স্থির সিদ্ধান্ত পেলো মধ্যরাত্রে। বেগম তহমিনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলো সে। যাবার আগে আক্ষেপ করে তিনি বলে গেছিলেন ফ্যান্সি যদি না বাঁচে তবে এই মৃত্যুর অর্থ আমি ধরে নেবো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে।

এবং প্রবল দেহ উত্তাপের মধ্যে ফ্যান্সি বিড় বিড় করে মাঝরাতে বল্লো, এ মৃত্যু আমায় মুক্তি দেবে, বিশ্বাস করো আমি মরতে চাইনি, তবু যদি মরতে হয়, তবে সে মৃত্যু নয় মুক্তি...

আর রেজ্জাক ভাবলো ফ্যান্সি যদি সত্যি না বাঁচে, যদি এই রাতই হয় তার জীবনের শেষ রাত তবে এই মৃত্যু তার কাছে একটা জিজ্ঞাসা হয়েই থাকবে চিরকাল সেকি সত্যি তার স্ত্রীকে ভালোবেসেছিলো ?

নিজেকে তক্ষুনি সে আবার প্রশ্ন করলো, তা কেন? এ মৃত্যু যদি অবশ্যম্ভাবীই হয় তবে তার জন্য তারা কেউ দায়ী নয়; প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় যেসব অঘটন রাজধানীর রাজপথে প্রায় সাধারণ ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে এটা তেমনি একটা ঘটনা মাত্র। ফ্যান্সির মত মেয়েরা মৃত্যু চায় না কোনকালেই। তারা শুধু জীবন নয়; সবুজ ভাবে, নানা রূপে। এই চাওয়া যদি অসুস্থতা পথ ধরেও অগ্রসর হয় তবু যে ফিরে আসা যায় না, অন্তত ফ্যান্সি পারেনি।

প্রাচুর্যের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। যৌবনে পেয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। পরিচয়ের সেই প্রথম দিনটি থেকে ফ্যান্সিকে একাকী কখনও ভাবা যায়নি। সে যেন সম্পূর্ণ ছিলো, অর্থময় ছিলো একমাত্র বন্ধু পরিবৃত্ত অবস্থাতেই তরুণ সঘের এই মক্ষীরাণীকে মুখোমুখী করতে গিয়ে তার রূপ মুগ্ধদের ব্যূহ ভেদ করতে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি তাকে। এবং শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়েছিলো দুঃসাহসের এক সিঁড়ি ধরে। বন্ধুরা যখন প্রচুর উপহারে, পৈতৃক যশে ও বাচালতায় ফ্যান্সি লাভে উগ্র-উৎসাহী, সে তখন ফ্যান্সির সঙ্গে স্থাপন করে বসলো দেহের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে সে তাকে টেনে আনতে পারলো বিয়ের পিঁড়ির মধ্যেও।

ফ্যান্সিকে বৌ করতে পেরে সে খুব আনন্দ পেলো যা ভাবতে পারলো তার প্রেম জয়যুক্ত তা নয়, তবে শুধু মনে হলো সে একটি নারীকে অধিকার করেছে, যাকে পাবার জন্য ব্যস্ত ছিলো তার মতো আরও অনেক ওপরতলার অভিজাত যুবক বাহিনী। হাঁ আরও একটা কথা তার মনে পড়েছিলো, সেটা তার জীবিকার দিক। কর্মজীবনে তাকে আরও বড় হতে হবে, আরো ওপরে ওঠার এই ধাপগুলিতে শুধু তার নিজের গুণাবলী নয় স্ত্রীর গুণের

সংযোজনাও চাই।

ফ্যান্সি সেদিক থেকে তাকে নিরাশ করেনি। ফ্যান্সির অনন্য সৌজন্যবোধ, মোহময় সামাজিকতা তাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে কিন্তু সেটা অধগতির পথ ধরুক সে তা চায়নি। আজকাল শুধু রাত করে নয়, প্রায়ই টল্‌তে টল্‌তে বাড়ি ফিরেছে ফ্যান্সি।

নেশার মাত্রা নিয়ে চিরকালই ফ্যান্সির একটু বাড়াবাড়ি। ইদানীং সেটা বাড়ছিলো। হৈ চৈ এবং উত্তেজনার মধ্যে সময়কে সংক্ষিপ্ত করে জীবন কাটাতে যে অভ্যস্ত, তার কাছ থেকে সে গৃহী জীবনের স্থিরতা খুব আশা করেছিলো এমন নয়। কিন্তু বিয়ের পর কিছু যে পরিবর্তন প্রত্যাশী ছিলো সে ফ্যান্সির কাছে, এ কথা অস্বীকার করবে কি করে? সেদিক থেকে ভীষণভাবে নিরাশ হয়েছে রেজ্জাক। বিশেষ করে ইদানীং তার প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করছিলো ফ্যান্সি, তাতে অপমানিত বোধের মাত্রা তীব্রতর হয়েছিলো। ফ্যান্সির মতো মেয়েকে কুমারীজীবনে জয় করেছিলো যে পথ ধরে, বিবাহিতা ফ্যান্সির উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের তেমনি একটা পথ ধরেই অগ্রসর হতে চাইলো সে। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে সতর্কতা দিয়ে পাহারা দিতে সুরু করলো ফ্যান্সি। স্পষ্টই একদিন বল্লো তুমি যা ভাবছো তা হতে পারে না।

রেজ্জাক প্রশ্ন করেছে—কেন পারে না?

এখনই মা হবার মতো দুর্মতি আমার হবে এ আশা তুমি আমার কাছে থেকে কি করে করো?

সব স্বামী স্ত্রীর কাছে যা আশা করে থাকে, আমাকেই বা তুমি তা থেকে আলাদা করে ভাবো কি করে?

দেখ যুক্তি দিয়ে যত সবলই হতে চাওনা কেন, তোমার উদ্দেশ্যে কিছুমাত্র সহযোগিতা নেই আমার। একবার তুমি চক্রান্তে জয়ী হয়েছ, কিন্তু আর হবার আশা করো না।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে সরে গিয়ে ঠোঁটের রংটা আরও একটু চড়া রেখায় ঘন করে তুলতে তুলতে ফ্যান্সি আবার বল্লো, জীবনের স্বাদ, যৌবনের অর্থ সবার কাছে সমান দর পায় না। তাই তোমার মতো বুড়োর লাঠি আর মায়ের সন্তান সম্বল করা জীবনের মধ্যে আমি তফাত দেখিনে কোনও।

ফ্যান্সি.....

রেজ্জাক উত্তেজিত হয়ে উঠলো— তাই যদি তবে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে কেন?

ফ্যান্সি ঘাড় ফিরিয়ে রেজ্জাকের উত্তেজিত মুখ লক্ষ্য করলো এক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে বল্লো তারপর, তোমাকে বিয়ে করার অর্থ এই নিশ্চয় ছিলো না যে, আমার দেহের সঙ্গে মন, রুচি, স্বাধীনতা সবই তোমার হয়ে গেল। তাই যদি তবে এই যে প্রায়

বিকেলগুলিই তুমি আজকাল মিসেস রহমানের সঙ্গে কাটিয়ে আসছ, ক্লাবে গলাগলি করে ফিরছো মিস্ জামানের সঙ্গে, আমি তোমার সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিতে গিয়েছি কখনও ?

তা কেন দেবে ? কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তোমার মতো সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছি কখনও ?

মা হতে না চাওয়ার অর্থ সীমা ছাড়ানো নয় রেজ্জাক। ওর প্রয়োজন আমি পঁয়ত্রিশের ওপারে পৌঁছে বোধ করবো। তাই আপাতত বছর দশেকের জন্য ঐ খেয়ালটি তোমাকে ছাড়তে হবে।

ফ্যান্সি যেন রায় দেবার ভঙ্গিতে ঐ কথাগুলি শেষ করে লীলায়িত ভঙ্গিতে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

এরপর গত একমাস ধরে কথা বন্ধ ওর সঙ্গে। রেজ্জাক তার নিজের অবসরগুলি যেমন কাটিয়েছে মিস্ জামান, মিসেস রহমান, মিসেস মতিনের সঙ্গে, ফ্যান্সিও তেমনি মিঃ আহাম্মদ, ডাঃ কামাল, ক্যাপ্টেন রুশ্‌দীর সঙ্গে।

বেগম তহমিনা মাঝে মাঝে এসেছেন মেয়ে জামাই-এর খবর নিতে। রেজ্জাকের সঙ্গে দেখা হলে ফ্যান্সির মেজাজ মর্জি নিয়ে অভিযোগ করলে উল্টো তিনি দায়ী করেছেন রেজ্জাককেই। সেও মুখ ফুটে বলে দিয়েছে, তার স্ত্রীর সব রকম খেয়ালের জন্য দায়ী তার মা, যিনি মেয়ের জীবনকে কৈশোর থেকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন খেয়াল, আত্মসুখ এবং স্বার্থপরতা দিয়ে।

তখন স্বীকার না করলেও বেগম তহমিনা জীবনভর যে অন্ধ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিলেন তার মেয়েকে, আজ রাতে বেদনার মধ্যে তারই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু,.....

ভাবনাটা বাধা পড়লো। ফ্যান্সি চোখ মেলে চাইছে। ঠোঁট নড়ছে তার। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে যেন কাছে ডাকলো স্বামীকে। রেজ্জাক সরে এলো। নরোম শোনালো তার গলার স্বর— কেমন লাগছে বলতো।

কি জানি, বোধ হয় ভালো নয়।

মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?

হচ্ছে। কিন্তু....

ডাক্তার বেশি কথা বলতে বারণ করেছেন ফ্যান্সি। তোমার সব কথা আমি শুনবো, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো।

দেহে অসুস্থতা তো দেখছো, মনের অসুস্থতা কে দেখছে...

ফ্যান্সি হাসলো। পাণ্ডুর মলিন হাসি। কিন্তু কোথায় তবু যেন সে দীপ্তিময়। রেজ্জাক চুপ করে রইলো। ফ্যান্সি খুব আস্তে আস্তে আবার বল্লো, আচ্ছা রেজ্জাক আমি কি খুব সস্তা হয়ে যাচ্ছিলাম সোসাইটির কাছে ?

ও কথা এখন কেন ফ্যান্সি ?

প্রশ্ন নয় জবাব চাইছি রেজ্জাক ! বন্ধুদের সঙ্গে বেশি মিশে

আর তাদের দৃষ্টিতে তোমাকে করুণার পাত্র করে তুলে আমি কি খেলো হয়ে যাচ্ছিলাম দিন দিন ? নয়তো... নয়তো...

একটু থেমে, ঢোক গিলে ফ্যান্সি আবার বল্লো, আমার অমতে আমাকে ওর ফ্লাটে নিয়ে যাবার দুঃসাহস মিঃ আহম্মদ কোথেকে সংগ্রহ করলো ? ওর ইচ্ছেতে ওর ফ্লাটেই যদি যেতে হবে আমাকে তবে পয়সার জন্য বা প্রবৃত্তির জন্য সোসাইটিতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান ঐ পলি— পপির সঙ্গে আমার পার্থক্য রইলো কি ? আমি সইতে পারিনি, বিশ্বাস করো রেজ্জাক ঐ চিন্তা ঐ পরিস্থিতি আমি সইতে পারিনি।

রেজ্জাকের স্থির নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে ফ্যান্সি ওর কথা শেষ করতে চাইলো— তাই আমি গাড়ি যখন আহাম্মদের ফ্লাটের একেবারে কাছাকাছি তখন আহাম্মদের হাত ধরে ঝাকানি দিলাম আঁচমকা। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

আহাম্মদের দুস্কর্মের ফল সে হাতে হাতেই পেয়েছে। কিন্তু নিজেকে আমিও আর নির্দোষ ভাবতে পারছিনে ফ্যান্সি। এই ঘটনা আহাম্মদকে দেহে আহত করেছে, আমাকে মনে। তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আমি খুশি হয়ে ছিলাম, কিন্তু ভালোবাসার আসনে ঠাঁই দিতে পারিনি বোধ হয়। তা যদি পারতাম তাহলে তোমার বদ খেয়ালগুলোকে ছাড়াতে প্রাণান্ত চেষ্টা করতাম, তার সূত্র ধরে নিজের অভিমানকে বড় করে দেখতাম না।

রেজ্জাক স্ত্রীর একটা হাত টেনে নিলো নিজের হাতের মধ্যে। ফ্যান্সিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, বালিশের বুকে এলিয়ে যেতে যেতে তবু সে বল্লো, তোমার এই স্বীকৃতি আমাকেও যেন বাঁচিয়ে দেবে নতুন করে। বাইরের অতৃপ্ত জীবন নিয়ে কেমন যেন একটু ছোট হয়ে উঠছিলাম আমিও নিজের কাছে।

কৃতজ্ঞতা

সাধারণতঃ দশটা দশ থেকে এই ঘরটা ঘড়ির কাঁটার মতো অমোঘ ও নিয়মিত হয়ে ওঠে। সাহেব যতক্ষণ আসেন না, আমাদের গতিটা ঢিমে তেতালা, গরুর গাড়ীর মত যতক্ষণে আসেন আমরা একেবারে এ যুগের প্রতীক রকেট। তার আগে গালগল্প, গুলতানী আর বারভাজা কথার তোড়ে গোটা দুনিয়াকে এনে হাজির করিয়ে দিই এই ছোট্ট ঘরের পরিধিতে।

কিন্তু সাহেবের গাড়ীর ভেপুটা যেই বাজা অমনি আমি নিধিরাম সর্দারী ছেড়ে নিরীহ তাল পাতার সেপাই। পৈতৃক নাম আবু হোসেন, ব্লাইণ্ড লেনের ব্যাচেলর মেসের এক ঘরের চার সদস্যের একজন। নিজের ঘরে যাবার আগে বড় সাহেব একবার ঘুরে দাঁড়ান। ঠোঁটের কোণে তামাকের পাইপটা বিশেষ ভঙ্গিতে একবার ছুঁইয়ে নিয়ে পর্যায়ক্রমে তাকান ঘরের চারটি অধীনস্থ প্রাণীর দিকে। যারা তখন মানুষ নামের খোলসে গোটা কতক অনুনয়ের ভঙ্গি মাত্র। সাহেব সেদিকে তাকিয়ে প্রীত হন। বিদেশ থেকে রপ্ত করে আসা পায়ের সামনের দিকে মুহূর্ত ভারের ভঙ্গিটা পলকের জন্য ঝিল্‌কে ওঠে। কোনদিন বিদেশী টানে ভালো আছি কিনা জিজ্ঞেস করেন,কোনদিন কাজের প্রসঙ্গ, কোনদিন ধমকে ওঠেন অকারণে একান্ত অভদ্রেরই মতো —কি দাঁড়িয়ে আছেন সং-এর মতো। কাজ করুন না যেমন করছিলেন।

ক্ষুণ্ণ হলেও করার কিছু নেই। সবই শক্তিমান বসের মেজাজ আর আমাদের মতো চুনোপুঁটির বরাত।

আজকের দিনটাও তার ব্যতিক্রম নয়। ঐ তিন মধুবাক্যের একটা উচ্চারণ করে যথাসময়ে কাট। দরোজার ওপারে চলে গেছিলেন বস। আমরা দেয়াল ঘড়িটার মতো সক্রিয় হ'য়ে কেউ কলম, কেউ টাইপ রাইটার চালু করেছিলাম। একটানা বেশ কিছুক্ষণ।

মুখ তুলে তাকাতে হ'লো। আমার টেবিলের ওপারে ভাঙ্গা, ছেড়া একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আধময়লা পোষাক, চার পাঁচ দিনের বাসি দাড়ির ওপার থেকে যে চোখ জোড়া মিনতির আবেগে ঝিকমিক করছে তাতেই যেন লেখা ছিলো প্রার্থীর আবেদন। শীলমোহর করা আবেদন। চিনতে ভুল হয় না

কখনও আমাদের। সুতরাং চুনোপুঁটির ভূমিকা থেকে মুহূর্তে আমিও একটা শক্ত সবল ঋজু টানে পরিবর্তিত হ'য়ে থাকবো। এবং স্বরে টেনে থাকবো রাশভারী গাম্ভীর্য— কাকে চাই ?

এটা কি মিঃ আমীরের অ.....

আর বলেত হবে না, তারই অপিস। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার দরকারটা কি ?

আমার ? তা একটু আছে। মানে তিনিই আমায় আসতে বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন ?

আমার চতুর ঠোঁটে চাপা একটু হাসি ফুটে থাকবে। চোখ দুটো সার্চ লাইটের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তার অপরিচ্ছন্ন মুখ ও পোষাকের মধ্যে তিনি একটু অপ্রস্তুত হ'তে গিয়েও পুরোন কোটের পকেট থেকে টেনে বের করলেন এক টুকরো কাগজ— এই দেখুন না, তার নিজের হাতে লেখা ঠিকানা।

দেখলাম। তাইতো। আবার তাকালাম। বল্লাম, তা কি জন্য আসতে বলেছিলেন জানেন কিছু ?

ভদ্রলোক মাথা নাড়ালেন— আপনাদের এখানে একটা পোষ্ট খালি আছে, তারই জন্য।

কিন্তু সে পোষ্টের জন্য একজন গ্রাজুয়েটের ক....

জী আমার এম,এ-তে হাই সেকেণ্ড ক্লাস ছিলো।

বটে, তা ওভার কোয়ালিফায়েড হ'য়ে আপনি কেন আসতে চাইছেন এ পোষ্টে ?

সে কি আর সাধ করে।

ভদ্রলোককে ভদ্রতার খাতিরেও বসতে বলা হয়নি। নিজে তিনি বসলেন একসময়ে। এক গ্লাস পানি চেয়ে পান করে আবার তাকালেন আমার দিকে, না এসে উপায় ছিলোনা বাবা। বড় দরকার একটি চাকরীর। আটজন পুষ্যি, আট মাস কাজ নেই।

বরাবরই চাকরী করছেন ?

না ব্যবসা।

একটা ঢোক গিলে বল্লেন, ব্যবসা ছিলো নিজের। সে যাক। ওঁকে একটু খবর পাঠান কাইণ্ডলী।

পাঠিয়েছি।

আমি নিজের কাজে মন দেবার ভান করলাম। মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে ততক্ষণে। বুড়ো তো চাকরীর উমেদার নয়, আমার দুরাশার মূর্তিমান বাধা। দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে পারলাম না। ঐ পোষ্টটির ভবিষ্যৎ দাবীদার আমিই। এর মধ্যে কোত্থেকে এসে জুটলো ওভার কোয়ালিফায়েড এই বুড়ো ! তাও কিনা সাহেবের নিজের হাতে লেখা ঠিকানা পকেটে করে ?

ভদ্রলোকের ডাক এলো এসময়ে। কাজের ছল করে আমিও

এলাম তার পিছু পিছু। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু আমাকে ভীষণ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো কাটা দরোজার মাঝখানে। বস তার চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও হঠাৎ যেন জোর করে নিজেকে সাটিয়ে নিলেন চেয়ারের দু' হাতার বেড়ীতে। কি ব্যাপার? হতচ্ছাড়া এই বুড়োকে দেখে উনি কেন উঠতে গেলেন? তবে কি দরিদ্র আত্মীয় কেউ ? হতাশ আগেই হয়েছিলাম। এবারে দীর্ঘনিঃশ্বাসভরা বুক এবং নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে ফিরে এলাম নিজের জায়গাটিতে।

খান বল্লো, ভদ্রলোককে তো মনে হয়েছিলো মেয়ের বিয়ে কিংবা ছেলের পরীক্ষার ফি চাইতে আসা দুঃস্থ নাগরিকদের একজন বলে।

করিম বল্লো, হবু শ্বশুকুলের কেউ। ঐ যারা হবু জামাই-এর রিয়েল রূপ দর্শনের জন্য সোজা এসে হাজির হন অফিসের মধ্যে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, অফিসের মধ্যে যত রকমের গল্প।

করিম হেসে বললো, কি ব্যাপার তোমার আবার মেজাজের বয়লার ফাটলো কেন ?

সে কি আর সাধে? কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ সকালে?

নির্ঘাৎ আমার মুখ। মেসে তোমার সীটের উল্টোদিকের কোণটাই তো আমার। কিন্তু কি ব্যাপার ? বুড়ো বুঝি তোমার প্রমোশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ?

প্রতিদ্বন্দ্বী কি বলছো ? হয়েই গেছে ওর কাজ।

কি করে জানলে?

চার আঙ্গুলে এই কপাল ঠুকে।

আমার কথার পর করিম নিশ্চয় কথা বলতো। সহজে ছাড়ার পাত্র ও নয়। কিন্তু থামতে হ'লো। বস বেরিয়ে এলেন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাদের ঘরের মাঝখানে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন বুড়ো। বসকে বল্লেন, ব্যাপারটা দেখবেন একটু ভালো করে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে আর বলতে। আপনার কাজ মানেই আমার কাজ !

সাহেব উৎসাহের সঙ্গেই বল্লেন মনে হলো। কিন্তু দুরাশা তো সহজে মরে না। তার শ্বাস যেটুকু ছিলো মনের মধ্যে সাহেবের স্বরে সে মরলো একেবারে। আমি মরার মতই চেয়ারে বসে রইলাম। আহা কি স্বপ্ন দেখছিলাম গত ক'দিন থেকে। প্রমোশন হবে, মেস ছেড়ে একটা বাসা নেবো অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন কোনও গলিতে। মাকে আনাবো.... হাঁ আরও একজনকে... তাকে দেখে এসেছি গত ছুটিতে। গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ঘর যাঁ বাড়ির মেয়ে বিলকিস। রূপে-গুণে খুত নেই। শুধু ওর বাবার খাইটা একটু বেশি। প্রমোশনটা পেলে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারতাম।

সুখ-চিন্তাটা বাধা পেলো। করিম মূর্তিমান শোকধ্বনির মতো এ সময় উচ্চারণ করলো, ভদ্রলোক নির্ঘাত সামনের হপ্তা থেকে জয়েন করবেন।

কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। এই না হলে আর কলিগ। আমার বুক জ্বলছে আর হতভাগাটার মুখে কিনা খৈ ফুটছে।

বসের ঘর থেকে এসময় বেরিয়ে এলো চৌধুরী। খান বল্লো, ছুটি পেলেন ?

চৌধুরী বিরস সুরে জবাব দিলো, না। সাহেবের মেজাজ ভালো নয়।

কি ব্যাপার ?

কি জানি। পায়চারী করছেন শুধু। যেভাবে চেম্বারে ঢুকে গেলেন, তখন থেকে আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছে বসের মনে কি একটা আলোড়ন চলছে ঐ ভদ্রলোক আসার পর থেকে।

তা নয় হলো কিন্তু আমার যে বারোটা বাজতে চলেছে। বোনটিকে আজ পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। আম্মা কি করে যে সব ম্যানেজ করবেন।

বস এসময় কিছু ভাবতে ভাবতে এ ঘরে এলেন। একটা দৃঢ়তার শক্ত টান তার চিবুকে। আমরা অপেক্ষা করছি অনড় হয়ে। কিন্তু নিঃশব্দে তিনি ফিরে গেলেন। একটু পর ডাক পড়লো খানের। পেন্সিল খাতা নিয়ে ডিকটেশন নিতে উঠে গেলো সে।

খান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমরা উৎকণ্ঠিত তিনটি প্রাণী এক সংগে প্রশ্ন করলাম, কি হলো ?

কিছু নয়। একটা দরখাস্তের জবাব।

কার?

ঐ বুড়ো ভদ্রলোকের।

তার মানে চাকুরী হয়ে গেল ?

আমি আৎকে উঠলাম। চেষ্টা করেও পারলাম না উত্তেজনাকে রোধ করতে। খান ঘাড় নাড়িয়ে আমার কথার জবাবে বল্লো, না তার উল্টোটি।

ধড়ে যেন পানি পেলাম। বল্লাম, হলো না তবে। কিন্তু কেন?

খান ছোট্ট করে বল্লো, বয়েস বেশী।

আমি যেন মুহূর্তে স্বর্গে বিচরণ করছিলাম। অমৃতের স্বাদ পাচ্ছিলাম চেতনার রাজ্যে। তারই মাঝে শুনলাম করিম বলছে, বেচারার জন্য দুঃখ হচ্ছে। বড় বিপদে পড়ে এসেছিলেন।

তা এসেছিলেন। কিন্তু বিপদ কেন সম্ভবত মরে গেলেও আমাদের বস তার দিকে ফিরে তাকাতে পারতেন না।

খানের জবাবে করিম কৌতূহলী স্বরে বল্লো, তার মানে ?

দার্শনিকের মতো হাসলো খান—মানে, এক সময় আমাদের বস, ঐ ভদ্রলোকের আপিসে চাকরী করতেন। ওঁর তখন বন্ধবন্ধু এ্যাভিন্যুতে জমজমাট ব্যবসা। আর বসের অবস্থা তখন আমাদের মতো। ক্লার্কের চাকরী পেয়ে বর্তে ছিলেন।

কি আশ্চর্য, সে অপরাধে ভদ্রলোক আজ চাকরী পেয়েও পেলেন না।

করিম সন্তর্পণে গালে হাত বুলেছিলো। কিন্তু তাকাবার সময় ছিলো না আমার। আমি তখন বাস্তবে নয়, স্বপ্নে রয়েছি। বিলকিসের স্বপ্ন।

ব্যর্থ প্রতিবাদ

মেঝের ইঞ্চি খানেক পানির ওপর ভাসছিলো নীল রঙের খামটা। কয়েক মাস আগে হলেও আক্ষেপের অন্ত থাকতোনা রায়হানের। মনে হতো পৃথিবীর অনেক রহস্য, অনেক মিষ্টি অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হলো সে। বে-আক্কেল ডাক পিয়নটার মুণ্ডুপাত করতো, পরক্ষণে বিরূপ হয়ে উঠতো বর্ষার আকাশটার ওপর। আর ঐ পুবের জানালাটা। বলিহারী বাড়ি তৈরীর কৌশল। একটু বৃষ্টি হলো কি না হলো বন্যা নামলো ঘরের মেঝেতে।

কিন্তু চিঠির ঐ দুর্গতিতে আজ সে নির্বিকার। অফিস ফেরা ক্লান্ত হাতে খামটা তুলে রাখলো টেবিলের এক কোণে। খোলার এতটুকু উৎসাহ নেই। তার চেয়ে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ার কথা মনে পড়লো তার। ভুল নেই ও চিঠি সাবেরার। জানা রয়েছে কি আছে ওতে। সেই বাড়ি দেখার তাগাদা। ইনিয়ে বিনিয়ে জানানো বাপের বাড়ি থাকা আর কোন মতেই শোভন নয় তার পক্ষে।

দূরগাঁয়ের এক প্রান্তে দু'টি মাস সাবেরা জীবন যাপন করছে নির্বাসিতার মতো একথা আজ মনে হলোনা বরং রাগ হলো। সেটা সাবেরা কি তার নিজের অক্ষমতার ওপর নিজেও বুঝলো না কিছুক্ষণ। শুধু মনে হতে থাকলো সাবেরা তো দূরে থেকেই খালাস নালিশ জানিয়ে, কিন্তু দুটি মাস বাড়ির খোঁজে তার যে সব তিক্ততা সে কথা জানাবে কাকে ?

এর আগে যে বাসাটায় ওরা থাকতো দু'কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ি সেটা। একটু সেকেলে, একটু গলির গভীরে। তা হোক। তারা মেনে নিয়েছিলো যাবতীয় অসুবিধাগুলি। যেহেতু বাসাটা ছোটর মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর খোকনের স্কুলটাও একেবারে কাছাকাছি।

কাটছিলো একরকম। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ডেকে পাঠালেন বাড়ির মালিক। নানা যুক্তি দেখিয়ে দাবী জানালেন ভাড়া বাড়ানোর। একটি রাত ভাবনার সময় চেয়ে, সাবেরার সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন জানিয়ে এলো চারশোর জায়গায় পাঁচশোই দেবে সে।

কিন্তু স্বস্তি তাতেও মিললোনা। ছ'টি মাস যেতে না যেতে আবার ডাক পড়লো। সাবেরা বলে দিলো, এবার যদি আগেরই মতো কথা বলেন, তবে যেন রাজী হয়ে যেওনা। সোজা বলবে

আর বেশি দেবোনা । দেবার আইনও নেই। বুঝলে তো।

নিশ্চয়ই। একি দিনে দুপুরে ডাকাতি নাকি।

রায়হান তেজের সঙ্গে কথাটা বলে ঘর থেকে বেরুলেও চুপসে গেল বাড়ীওয়ালার কাছে এসে। দু'ভদ্রলোক বসে আছেন তার দুদিকে। অচেনা। কিন্তু চেনা হয়ে গেল আন্দাজে। বাড়ীওয়ালা সবিনয়ে বল্লেন, দেখুন রায়হান সাহেব আমি ঠিক করেছি বাড়িটা রিপিয়ার করে আধুনিক বাথ আর ট্যাপের ব্যবস্থা করে নতুন ধরনের করবো। তা দেখুন ওসব করলে এ বাড়ির ভাড়া উঠবে পুরো সাতশোতে আর তো নেবার লোকও রয়েছে বিস্তর-------

কথার মাঝে দু'পাশের লোক দুটির সঙ্গে চোখাচোখি করে তিনি আবার বল্লেন, কিন্তু সাহেব আমি বলি কি মানুষের বিবেক তো রয়েছে। পুরনোর দাবী সবার আগে। তাই আপনাকে ডাকা।

রায়হান সটান দাঁড়িয়ে বল্লো, না অত ভাড়া আমি দিতে পারবোনা।

তাহলে?

বাড়িই বরং ছেড়ে দেবো।

সে তো ভালো কথা। তা ছাড়বেন কবে,আমাকে আবার তেমন অবিবেচক মনে করবেন না। যত দিন বাসা না পান আমি অপেক্ষা করবো।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

নিজের ঘরে এসে রায়হান ফেটে পড়ল দুঃসহ ক্রোধে—নাও জিনিসপত্র বাঁধো।

সাবেরা অপিসের ব্যাগ, রুমাল গোছাচ্ছিলো।

সবিস্ময়ে বল্লো, তার মানে ?

মানে আবার কি। সব কিছুর মানে থাকবে তারই বা কি অর্থ।

ওর অকারণ রাগ হাসিয়ে দিয়েছিল সাবেরাকে। কাছে এসে বল্লো, কি হয়ছে বলত। মেজাজ এত চড়ায় ?

চড়া টড়া কিছু নয়। ওদের বলে এসেছি এবাড়ি ছেড়ে দেবো, সম্ভব হলে আজই।

ইস আজই--

সাবেরা যেন আর্তনাদ করে উঠলো। রায়হান বল্লো, অসম্ভবটা কিসে। কাল থেকে খোকনের সামার ভ্যাকেশন শুরু হবে। তুমি বেগমপুর যাওনা বছর ঘুরে এলো। এবারে থেকেই এসোনা মাসখানেক।ইতিমধ্যে-----

সাবেরা গম্ভীর হয়ে এসেছিলো। কথার মাঝে বাধা দিয়ে বল্লো, নতুন বাসা পাওয়া কি অত সোজা, আর তুমিই বা হট করে কোথায় গিয়ে উঠবে।

আমার জন্য ভেবোনা। আমার জন্য মেস আছে, কোনও বন্ধুর বাইরের ঘর আছে। কিছু না থাকলেও ফুটপাথের অভাব

হবেনা।

ওর অভিমানী ছেলেমানুষী সুরে আবার হেসে ফেলেছিল সাবেরা। লঘু স্বরে বলেছিলো, ঠিক আছে ফুটপাথ না হলেও গাছতলা নিশ্চয়ই আছে। আর তাতে থাকা হবে কি হবেনা বোঝা যাবে ঠাণ্ডা মাথায়। এখন খেয়ে দেয়ে আপিস যাওতো।

হাসিমুখে রায়হানকে আপিসে পাঠালেও সারাটা দিন সাবেরা মন দিতে পারলোনা অন্য কাজে। সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো বর্ষায় এতে নোনা ধরবে। সামনের গলিটা ভরে যাবে থকথকে কাদাতে। তখন ঐ ক'হাত জমি পার হবার সংগ্রাম দু'বেলা রায়হানকে মনে করিয়ে দেবে পুলসেরাত পার হবার কথা। তাছাড়া বাজার এ বাড়ি থেকে বেশ দুরে, আপিস তো আরও। সে অসুবিধাগুলিকে চিরন্তন সঙ্গী বলে মেনে নিয়েছিলো তারাই যেন দিন ভর খোঁচাতে লাগলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে। রায়হান ফিরে আসতে তাই বল্লো, কাল দুপুরের গাড়িতেই পাঠিয়ে দাও আমাদের।

এই সিদ্ধান্ত রায়হানকে ফিরিয়ে দিলো তার মেজাজের স্বাভাবিকতা। ব্যাপারটাকে একটা অন্যায়ের প্রতিবাদের মতোই নিলো সে। সাবেরার সমর্থন তাকে আরও সবল করলো।

খোকনকে নিয়ে সাবেরা চলে যেতে সেও সোজা উঠে এলো মেস-বাড়ির এই ঘরটাতে। পার্টনার একজন ছিল কিন্তু তা নিয়ে আক্ষেপ করলোনা। একটা প্রতিবাদের তৃপ্তি তাকে নতুন করে আশ্বাস দিচ্ছিলো। আপিসের পর, আর ছুটির দিন অদম্য উৎসাহ নিয়ে তাই সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো একটি বাসার খোঁজে। বাসা পায়নি এমন নয়। রাজধানীর নাগরিক সংখ্যা দিনে দিনে যেমন বাড়ছে সেই তুলনায় গৃহ নির্মাণের সংখ্যাও। তার তো প্রয়োজন মাত্র দুটি ঘরের। তিনটি মানুষের ছোট একটি পরিবার পাঁচছয় শোর মধ্যে ধরাই যাবে বাস উপযোগী কোন একটিকে।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গলো কিছু দিনের মধ্যে। প্রয়োজনের তুলনায় বাড়ির সংখ্যা শুধু কম নয়,মূল্যায়নের দিকেও তা প্রশ্ন বহুল। কোথাও আলো বাতাস খোলা দুটি ঘরের ভাড়া হাজার দুহাজার হেঁকে বাড়িওয়ালা যেন নিজেই কুন্ঠিত। কোথাও আলোহীন অন্ধকূপের সগোত্র গৃহকে মুখে প্রশংসা করে ভাড়াটেকে বিভ্রান্ত ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত। কেউ বা সোজাসুজি দাবী করে বসেন কর্মস্থানের ঠিকানা কিংবা পরিবারের ইতিবৃত্ত। কেউ আবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলেই ফেলেন, কিছু মনে করবেন না, বয়স তো খুব বেশি নয়, সত্যি সত্যি বিয়ে করেছেন তো।

বিশ্রী এই জেরার মুখে মেজাজ ঠিক থাকেনা। বলে, ধরুন আপনার সন্দেহই ঠিক কিন্তু বিয়ে করিনি বলে কি মা বোন নিয়ে থাকতেও মানা।

আরে সাহেব রাগেন কেন। মিষ্টি কথা শোনাই কি আর

এমনি।ভুক্তভোগীসাহেব—ভুক্তভোগী।

বাসা ঠিক করা মাথায় থাক অধিকাংশ জায়গা থেকেই ফিরতে হয় কথা কাটাকাটি করে।

এই বিভ্রান্তিমূলক বিরক্তিকর অবস্থাগুলি একান্ত অবসরকে করে তুলছে কেমন দিশেহারা অসহায়। অবশেষে সে ঠিক করেছে হাজার টাকাই দেবে সে। তবু বাস করার মত ঠাঁই চাই একটু। যদিও তার মতো দুহাজারী চাকরীজীবী লোকের জন্য ওটা বিলাসেরই নামান্তর, তবু---। পরিহাস সেখানেও। তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেও ফল হয়নি। অভিজ্ঞতা হয়েছে আরও তিক্ত—হাজার টাকায় ভাল বাড়ি ? হাসালেন সাহেব হাসালেন। এটা শহর ঢাকা তার ওপর রাজধানী। ভুলে যান কেন।

এসব কথার জবাবে লাভ কখনও আসেনি, বাক বিতণ্ডার তিক্ততা ছাড়া। তাই দু'হপ্তা ধরে বাসা খোঁজ ছেড়েই দিয়েছে সে। তার চেয়ে আপিস ফিরে পার্কে বসে থাকা ভালো। নিদেন পক্ষে মেসে তাস পেটা কিংবা অসময়ে নিদ্রা।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে স্থির হতে দিচ্ছেনা সাবেরার ঐ নীল খামের চিঠিগুলি। যার সুর একটিই, খোকনের স্কুল কবে খুলে গেছে খেয়াল আছে ? আর বাপের বাড়ি বেশি দিন থেকে মান সম্মান খোয়াতে রাজী নই আমি। ব্যবস্থা একটা করো।

রায়হান তিক্ত হাসে—আঁচলের পয়সা ডাকঘরকে দান করার জন্য সাবেরা মুক্তহস্ত হয়ে উঠেছে। সপ্তাহে আগে দুটি চিঠি আসতো, ইদানিং চারটি, ভয় হচ্ছে এরপর না দৈনন্দিনে দাঁড়ায়।

কিন্তু তা দাঁড়াবার আগেই এক সকালে পেছনে একটা কুলি আর সামনে খোকনকে নিয়ে মেসের এই ঘরে এসে দাঁড়ালো স্বয়ং সাবেরা।

সেদিন আবার তাসের আড্ডাটা তার ঘরেই জমে উঠেছে। একদল খেলছে, একদল দেখছে। দুটো দলই হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল দোরগোড়ায় সপুত্র সাবেরাকে দেখে।

পরস্পর নীরব চাউনীর মধ্যে রায়হান শুধু বলতে পারলো, তুমি !

বাকিরা কেউ মুখটিপে হেসে, কেউ ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে গেল। রায়হানের পার্টনার শুধু যাবার আগে আহ্বান জানিয়ে গেল, ভেতরে এসে বসুন ভাবী।

সাবেরা ভেতরে আসতে রায়হান বেরুলো রিক্সা বিদায় করতে। ফিরে এসে দেখলো ইতিমধ্যে কে যেন খোলা দরজায় টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে একটা পুরানো লুঙ্গির পর্দা।

লজ্জায় গ্লানিতে যেন নুয়ে যাচ্ছিলো সে। ভেবেছিলো সাবেরার এই অমার্জিত দুঃসাহসকে কিছুতেই সে সহ্য করবেনা। কিন্তু লুঙ্গির পর্দার এপাশে এসে সাবেরার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে

অপরাধবোধের একটা আলা অনুভব করলো। বাইরে বোর্ডারদের ফিস-ফিসে স্বর, পার্টনারের বদান্যতা, সাবেরার বিপন্ন বসার ভঙ্গি, চেতনাকে আঘাত করছে বিশ্রীভাবে। এরই মধ্যে খোকন এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে বল্লো, জানো আব্বু নামী খুব কাঁদছিলেন, তবু আপ্পি জোর করে চলে এলেন।

খোকনের স্পর্শে নিজেকে অনেক সহজ মনে হলো রায়হানের। দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকা সাবেরার উদ্দেশ্যে মিথ্যে করে সে বল্লো, জানো সাবেরা আজই তোমাকে চলে আসার জন্য টেলিগ্রাম করতাম।

সাবেরা ভারী স্বরে বল্লো, ঐ ঘরে ঢুকেই তো দেখলাম তার নমুনাটা।

বিশ্বাস করো বাসা একটা ঠিক হয়ে গেছে।

সত্যি বলছো?

ঘুরে বসলো সাবেরা। রায়হান ঘাড় নেড়ে বল্লো, সত্যি। তবে কিনা সেই আগের বাসাটাই। নতুন করে সেটা বড় সুন্দর হয়েছে। মানে সুবিধাজনক আরকি। আর ঐ যে গলিটা ইউনিসিপ্যালিটি থেকে সেটা নাকি একদম পাকা করে দেবে। ভেবে দেখলাম সাতশো টাকায় ওর চেয়ে ভালো বাসা হয়না।

একটানা কথা বলে তার খেয়াল হলো আগাগোড়া মিথ্যে বলছে। আর পুরোন বাসা বলে সাবেরার চোখেও নেই ক্ষণপূর্বের আনন্দটুকু। তবু সে উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমার এখুনি একবার বেরুতে হবে। বাড়িওয়ালাকে বলে আসি ও বেলাতেই আমরা উঠবো।

রায়হান আলনা থেকে সার্ট নিলো। না, যাত্রাটা তার আজ মিথ্যে হবে না। কাল ও পথ দিয়ে আসিস ফেরার পথে দেখে এসেছিলো বাসাটা। খালি হয়েছে সম্প্রতি। বাড়িওয়ালা পথেই ছিলেন, দেখা হতেই হেসে বলেছিলেন, হে—হে—সেই যেসেই আছেন। বৌমা বুঝি বাপের বাড়ি। তা এখানেই আবার উঠুন না এসে। ভাড়ার ব্যাপারে বড় রেগুলার ছিলেন আপনি। তাছাড়া এতদিন ছিলেন একটা আলাদা মায়াই পড়ে গেছে আপনাদের ওপর। তবে ভাড়া একটু বেড়েছে। মানে বাড়াতে বাধ্য হয়েছি পুরো একহাজার।

কথাটা সত্য নয়। স্বার্থটাই বড়। তবু এই মুহূর্তে তার জন্য কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মনে এলোনা। হয়তো এই আপোস দুদিন পর বিবেককে আঘাত করবে, বিকৃত হবে নিজেরই কাছে, তবু তারই জন্য রায়হান ব্যগ্রতা অনুভব করলো, দ্রুত পৌঁছুতে চাইলো পরিত্যক্ত সেই ঠিকানায়।

মোষের ইলিশ

দূরে ছেলে দুটির ধারে একটা ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে। আরোহী নাইন ধরে ছুটছে একলার মানুষ। ওর মধ্যে আপেক্ষ আছে। দেশ থেকে বদলদারা করে আসবে কামলজন তথার জন্য যারা মুজন চাই। জেবুন্নেছার আবার গ্রামের মসজিদ থাকল ছেলেটা যে এতো জমের পর চার বছরেও টের পাননি আসী মেওয়াজ। জাত দিকে তাকাবার সময়ই তাঁর ছিলো না। ধান্ত দুধু টাকা রোজগারের।

আজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে উল্টো দিকের পড়শীদের দেখছেন। সেদুনবাগানের তথা ও মজুমদারের কি যেন কাজ করে লোকটা। হাতে থলি বাজার। কালেভদ্রে গলায় কথা বলে। এক বাঁক খোকা-খুকুর জন্মদাতা রবি আহমুদ। পাশে আলতাজের যেটাবুটি ব্যাপারী। ভেতরে একটা চটুল মানুষ এখনো জীবিত। ম'টার পর মজেলরা চলে গেলে অটরডালাকে ইশারায় ডেকে বাবায় যেমন। ভ্যালি স্টোরের মালিককে দেখলে একটা খুব ছোট বেড়ালের কথা মনে পড়ে। সাদা মুখির ওপর ব্রাউন পাজামী। আলো নাড় হলেই শহর সাপোর্ট গ্রুপ থেকে ফিরে আসে আঠারোর নিচের তরুণী। অফটে মধী মোহাম্মদ। ওর মেয়েকে নিয়ে তার বহরই গ্রুপ ওঠাটি লাগে। আজ সন্ধ্যায় ওদের সবাইকে বড়ো আপন মনে হয়েছে।

আজ উঠোনে সাবিত্রীমা চাদিতে লাল, নীল মানবের চোখ আলিয়ে ঈতিবতো মজলস বসে। জেবুন্নেছার মাথ পাকা ঘড়ি হয়েছে, তথতা নই। মজুদের ইচ্ছে মজুদের সাথে আরও টাটের কেউকেটা হবার । আর তার নিজস্ব চাহিদার মুখিয়েছে আপনি দাঁড়ানো মাত্রই ছোটে ছিতে অনিচ্ছার হওয়া। আর একলার দেখে খেলে মিশ্চিন্ত ক'বছরের মতো।

প্রথমটায় রাজী হননি। পরে মেশার মতো শেষে বসেছিলেন চিত্তাটা। নিজস্ত মিলেন। প্রতীক মাথ ঠিকের জন্য ঠৈক ডাকলেন।

হাতিকেন। ওটা আগেই একলার কথা করে নিয়েছে। কাল মূল। দেশার ছিমিল বিদু মাথে আসে কম। কমলা। কল তাদু, বিদু বর্তমানে মজলসের জল-তথতার বাইরে। পটি পছ। দুধরে বাঁ। আপর মতি। মুজনী, বিদু সম্পর্ক জীবিতের ছোট মৃত

মানুষের সঙ্গেই বেশি। হাতি কিংবা ঘোড়া? খাদ্য ঘাটতি আর গতির যুগে একেবারে অচলমাল। তবে ধান লক্ষ্মীর নামে নাম হোক। মানিক দীঘা। লোক হাসবে।

ক্যানো?

রেশনের আতপ আর নাকপেচিতে পেটে চড়া পড়েছে যেখানে, সেখানে কিনা মানিক দীঘার মতো স্বাদু চালের অবাস্তব ভরসা। তাছাড়া শহরে মানুষ ভোট দেবে। তাদের পরিচিত শব্দ চাই।

তবে তো ফিল্মি স্টারের নামে নাম রাখতে হয়।

দূর মিয়া তার চেয়ে কলা গাছ রাখো। শুভ কাজের প্রতীক। ফলটাও প্রিয় খাদ্য শহুরে মানুষের।

তা যদি বলো তবে ইলিশের নাম এক নম্বরে। বত্রিশ মাথার ভোটে ইলিশই টিকলো শেষ পর্যন্ত।

পরের প্রশ্ন ছড়া, ফেস্টুন, ইলিশের প্রতিমূর্তি।

বাবুল লম্বা চুল ঝাঁকালো— নো প্রবলেম। আমরা জানি দোস্ত কাগজে লেখে। কালই চলে আসবে রেডিমেট ছড়া।

এলোও। হাতে হাতে ঘুরলো লাইন দুটো—

ইলিশ শুধু মাছ নয়,
মঙ্গলের প্রতীক
ভোট যে দেয়না এতে, তার জীবনে ধিক।

মোম দিয়ে তৈরি হয়ে এলো অতিকায় ইলিশ। কার্নিসে কায়দা করে সেট করা হলো সেটা। সন্ধ্যায় তার লেজ থেকে নিয়নের আলো চমকায়।

পাড়ার এখানে সেখানে আরও আরও প্রতীক। পরস্পরকে টেক্কা দেওয়া। পোস্টারে ঢাকা পথের ধারের থাম, দোকানের মাথা, বাড়ির দেওয়াল, গাছের উঁচু ডাল। চামচারা সরে-জমিনে তদারক করে জানিয়ে যায়, তার মোমের মাছই সেরা।

আলী নেওয়াজ গোঁফের ফাঁকে হাসি লুকিয়ে রাখেন। মনটা বেজায় হাল্কা হয়ে যায়। একটু আগে জেবুন্নেছার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে পপি-বেবীকে নিয়ে। জেবুন্নেছা গদ গদ আনন্দে বলছিলেন, ওরা দু'জন কি সুন্দর ডুয়েট গান গায় দেখেছো। তোমার তো জানাশোনা কতো। টিভি প্রোগ্রাম যদি করাতে পারো তবে—

কি সম্মান বাড়ে? কিন্তু গানগুলো কি? রূপে আমার আগুন জ্বলে, যৌবন ভরা অঙ্গে... এসব গান বাচ্চাদের মুখ দিয়ে? তোমার হলো কি?

জেবুন্নেছা ভার মুখে সরে গেছিলেন। আঁচলের তলা থেকে সটকে গেছে পপি-বেবী। এখন আলী নেওয়াজের চিন্তার মুখ ঘুরছে। ওদের দোষ দেবেন কি? রেডিওতে ঐ লাইনগুলোই তো

দিনরাত কান ঝালাপালা করে। শুধু গান? মায়া-রাজার যে ঢালাও বিজ্ঞাপন, শশি-বেবী নতুন নামের চকলেট ভেবে দোকান থেকে কিনতে গিয়ে নাকাল মুখে ফিরেছে একদিন। বাবুল ধরে এনেছিলো। তিনি দিয়েছিলেন দুটো চড়।

ডেকে আদর করতে ইচ্ছে হলো। বাবুল এসে টাকা চাইলো তখনি। বাইরের ঘরের বিকেলের নাস্তা।

বাজেট মোটামুটি একটা করাই ছিলো। কিন্তু ক'দিনেই টের পাচ্ছেন বাস্তব অগ্রাহ্য করছে সেটাকে। গ্যাসের বাড়তি চুলো প্রায় জ্বলে সারাদিন। বাইরের ঘর ঠাসা পাড়ার ছানাপোনায়। পোনাসের বাপরাও শরীক কখনো। চা-বিস্কুট স্থির। কারু কারু জন্য ভাত-মাছও। বিশেষ বৈঠকি দিনে বিরিয়ানী সালাদ।

জেবুন্নেছা যখন আর ধকল সামলাতে পারিনে পারিনে বলে চেচাচ্ছেন, তখনি সামনে পড়লো রোজা। ভোটের তারিখ পিছালো মাসখানেক। মাথায় হাত দিলেন আলী নেওয়াজ। জেবুন্নেছা পরামর্শ দিলেন, বৈঠকখানা বন্ধ করে দাও।

বাবুল সায় দিলো। ঘাড় দোলালেন আলী নেওয়াজ—অসম্ভব। এমনিতেই তার চেয়ে ভালো দানা পানি ছাড়ছে সৈয়দ সাহেব, গফুর শিকদার। সামনে আবার রোজার মাস। ইফতারী তো বটেই, সেহেরীর আবদার ধরলে তাও মেটাতে হবে।

পেলো রোজা। এলো ঈদ। হাত এরই মধ্যে টান টান। নতুন পয়নার বদলে গিন্নীকে মিঠে কথায় সামাল দিলেন। ছেলে-মেয়েদের জন্য সামনের ঈদের বড়ো রকমের আশ্বাস।

আল্লাহ আল্লাহ করছিলেন শীতটা যেনো এবার শুরুর দিকেই জাকিয়ে না আসে। তাহলে চাদরের খাই যে কতো মেটাতে হবে তার ঠিক নেই। বাইরের ঘরের ছানাপোনারা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে এর মধ্যেই বলাবলি করছে, ওহ্ সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটে যা সব কার্ডিগান এসছে না বিদেশ থেকে! ইচ্ছে করে রসগোল্লার মতো গিলে ফেলি।

শুকুর খোদার, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকেও শীত দাঁড়িয়ে রইলো শহরের বাইরে। ছানাপোনারা শুধু গেঞ্জি গায়ে ভোটের আগের রাতেও পোস্টার আঁটতে লাগলো নতুন করে। পাল্লা দিয়ে জ্বলতে লাগলো মোমের ইলিশ। নামী শিল্পী দিয়ে আঁকিয়ে আনা হয়েছিলো তার বিশাল প্রতিকৃতি। ছবির চারপাশে দাপাদাপি করলো হরেক রঙের মিনি বালব, টুনী বালব।

আরও কিছু করা দরকার। আরও কিছু। এরই মধ্যে মাথা খারাপ করে দিলো একটা খবর। গফুর শিকদার বিরাট বাহিনী আর ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছেন। মূল দলের সঙ্গে বাজনার তালে তালে যোগ দিচ্ছে পাড়ার সব কিশোর।

বাবুল ছুটতে ছুটতে খবর নিয়ে এলো। না, মিছিল এগুতে

পারেনি, পুলিশ আপত্তি জানিয়েছে। হৈ চৈ করা ব্যাপার স্যাপার চলবে না। সকালে একটা দল পেছনে করে নীরবে পুরো পাড়া চক্কর দিলেন আলী নেওয়াজ। ফিরতিপথে দেখলেন ভাড়াটে নবী মোহাম্মদের দজ্জাল মেয়েটা স্কুল বান্ধবীদের নিয়ে তার জন্য বাড়ি বাড়ি ক্যানভাসিং করে বেড়াচ্ছে।

জুড়ানো চোখ টনটনিয়ে উঠলো আবার উল্টোদিকের মিছিল দেখে। সৈয়দ সাহেবের পেছনের লাইনটা তার চেয়ে খাটো, কিন্তু চড়া রোদে লোকটা ঘুরছে খালি মাথায়। যেখানে তার পরামর্শদাতারা তাকে পথে নামিয়েছে চাকরের হাতে ছাতা দিয়ে।

গফুর শিকদার আজ পথে আসেনি। কলকাঠি ঘোরাচ্ছে পাড়ার সম্পর্কজাত আত্মীয়-স্বজন আবিষ্কার করে। বাক্স বাক্স মিষ্টি শুভেচ্ছার নিদর্শন পাঠিয়ে। মোমেন তরফদার তার প্রতীক ঘোড়াকে ঝকঝকে সাজিয়ে রাস্তায় বের করে তার পিঠে সওয়ার করে দিয়েছিলেন জনপ্রিয় হিট গানের টেপ। রওশন আলীর হয়ে সত্যিকারের উড়োজাহাজ আকাশ থেকে ফেলছে কাগজের ফুল।

বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরে শুনলেন প্রচুর হাসাহাসি। হান্নান মহাজনের জ্যান্ত প্রতীক ছাগলদের একটাও কাল রাতে ফিরে যায়নি। হায় হায় করছে আরও একজন প্রতিযোগী। যার ধবলী গরুটা গায়ের চামড়ার লেখা নিয়ে মনিবের প্রচার কাজ চালাচ্ছে গত এক মাস, সেটাকে ছেলা অবস্থায় পাওয়া গেছে কালভার্টের তলায়।

সুখবর পেশ করেই জোকার দিয়ে উঠলো ছানা-পোনারা—

আলী ভাই আলী ভাই

তারে ছাড়া গতি নাই।

পরের দিনটা ভোটের। রীতিমতো উৎসব চেহারার। কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপচানো মানুষ। পথে পথে মোটামুটি ভালো কাপড় পরা স্ত্রী পুরুষের ঢল।

প্রেসার চড়া পুরো দিন। উড়ো খবর—ব্যালট বক্স একটা গায়েব হয়েছে সন্ধ্যের অন্ধকারে। লাগোয়া গ্রাম থেকে একচেটিয়া ভোট পেয়েছে গফুর শিকদার। আর এক দল গুঞ্জন তুলেছে সৈয়দ সাহেবের গুণগানে। ঝড়ের মতো তখনি আর একটি কলরব। জিতেছে বটগাছ। কয়েক ডজন রিকশার মালিক হান্নান মহাজন। বস্তির সব মানুষকে সেই টেনেছে।

আলী নেওয়াজের চোখের ওপর স্পষ্ট হচ্ছে ঈদের দিনের বাদ নামাজের দৃশ্য। বস্তির লোকদের শাড়ি লুঙ্গি দিয়েছিল হান্নান মহাজন। আর তিনি মাথাপিছু চার আনা। মুখরা এক যুবতী পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে পরিহাস তরল গলা ছুঁড়েছিলো তারপর —এক সিকিতে ভোট কিনা যায় না সাহেব।

পায়চারি করছিলেন বাড়ির সামনে। অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর

খুব কাছে একজোড়া ছায়া। মোমেন তরফদার আর গফুর শিকদার। পড়ন্ত বেলা এই দু'জনের সঙ্গে ভেজাল ভোটার নিয়ে কেন্দ্রের মাঠে প্রায় হাতাহাতি বাধার মতো হয়েছিলো না। তারাই এখন ঘনিষ্ঠ জনের মতো ফিসফিসে গলায় বলছেন, ছি ছি! শেষে একটা রিকশাওয়ালার কাছে নাক কাটা।

রাত যতো বাড়ছে, হাদপিণ্ডের শব্দ তার চেয়ে বেশি। দু'বছর আগের একটা রাত কাঁপছে বুকের তলায়। চেয়ারম্যানের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। যোগ্য লোক হয়েও জিততে পারেননি। এবার যদি হারেন তবে সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভীষণভাবে। বড়ো মেয়েটার বিয়ের কথা চলছে, টাকার জন্য সেটা আটকাবে। ব্যবসার ক্যাপিটালে টান পড়বে। ঝুলে থাকবে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু।

ছাদে পায়চারি করছিলেন। দশটার দিকেও রাত নয়। তবু কদিনের উত্তেজনায় পাড়া যেনো নীরব হয়ে গেছে আজ বড়ো বেশি। আচমকা হৈ চৈ। জীপের ছেলেরা চেঁচাচ্ছে হান্নান শিকদারের জয় জোকারে। তাঁর বাড়িটা পার হবার আগে অকারণে তালি বাজিয়ে চমক দিয়ে গেছে নিশুতি রাতকে।

বুকে হাত চেপে তিনি নেমে এসেছেন। ছাদে উঠেছে বাবুলরা। পরাজিত মানুষের লাশ যেমন নিঃশব্দে নামে কবরে, কার্নিশ থেকে তেমনি নেমেছে মোমের ইলিশ।

শোকটা দগদগে থাকতেই জেবুন্নেছা বয়ে এনেছে দুঃসংবাদ। ভাড়াটেরা ভাড়া বন্ধ করেছে গত দুমাস। ঠিক বন্ধ নয়, বাবুল কিছুতেই তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে দেবে না। এই নিয়ে বাপ-ছেলের এক পশলা লড়াই হয়ে গেছে। ভোটের জন্য চুপ ছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া দেবার আগে কাজীর অফিস থেকে বিয়ে করে ফিরেছে বাবুল। নবী মোহাম্মদের মেয়ে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো বই বুকে, কামিজ-সালোয়ারে। বিকেলে ফিরেছে হাজার বুটির বেনারসী জড়িয়ে। বুঝলেন, ভোট পরবের বড়ো মারু ছিলো তার নিজেরই ছেলে। ওকে কিছু বলা যায়নি। জেবুন্নেছা, ভাড়াটে, কাউকে নয়। উল্টো তাকেই নানা কথা হজম করতে হয়েছে।

হার্ট এ্যাটাক হয়ে হাসপাতাল ঘুরে এলেন। ক্ষতির কথা ভুলতে পারেন না,থেকে থেকে বুকের ভেতর ব্যথা হয়। ডাক্তারের নির্দেশ, চিন্তা ভাবনা চলবেনা। পুরোপুরি বিশ্রামে না থাকলে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। আবার শিগ্রী হতে পারে হার্ট এটাক। আলী নেওয়াজ লম্বা নিশ্বাস টানেন, চিন্তার, সিদ্ধান্ত নেবার একটু এদিক-ওদিক হলেই এমনি করে কি দাম দিতে হয় জীবনকে ?

বাগানের নাম মালনিচেরা

কোথায় যেনো শিউলী ফুটেছে। নাগকেশর। স্থলপদ্ম। কি বলো তো?

আসলে কিছু ফোটেনি। সবগুলো ফোটার সিজনও আলাদা আলাদা। তবু তুমি যখন গন্ধ পাচ্ছো নিশ্চয় ফুটেছে।

জবাবটা রোমান্টিক নিঃসন্দেহে কিন্তু তোমাকে মানাচ্ছে না একদম।

মানে-

প্যান্ডোরার চোখখোলা আধখানা। মুখ ছড়ানো চাঁপা হাসি। হঠাৎ শওকত তাকালো নিজের দিকে। সাদা হাফ প্যান্ট। সাদা সার্ট। হাতে ছড়ি মাথায় টুপি। এই বেশে এমন ডায়ালগ বেমানান সত্যি। হেসে ফেলে বল্লো, তুমি খবর দিয়ে এলে না ক্যানো; দিব্যি সেজেগুজে থাকতাম।

চেপেরাখা হাসি চা বাগানের খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে প্যান্ডোরা বল্লো, প্রথম ডিসিশনটা তাই ছিলো। ফুল প্যান্টপরা রাজা, ফ্রকপরা রাণী যেমন আমাদের চোখে ভালো লাগে না, তেমনি লাগবেনা হবু বরকে ইংরেজ আমলের প্রায় দারোগা ড্রেসে দেখতে। পরে ভাবলাম বিয়ের পর কতো দেখবো। আগেই একটু দেখে আসি না ক্যানো লাক্কাতুরা টি গার্ডেনের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার-কাম-ম্যানেজার শওকত নেওয়াজকে তার আপন ক্ষেত্রে কেমন দেখায়।

সাধ মিটলো ?

কেমন করে মিটবে ? তোমাকে নানারূপে দেখার যে সাধ জন্মজন্মান্তরের। আচ্ছা বলো তো-

তার আগে তোমার একটা ভুল ভাঙ্গাই। যেখানে এসেছো এটা লাক্কাতুরা নয় মালনিচেরা চা বাগান।

ভুল নয়। ঐ নামটাই মনে ছিলো। ভারী মিষ্টি আর আদুরে নাম, মানে কি বলো না।

জানিনা। শুনেছি হজরত শাহজালালের ওখান থেকে লাকড়ী তোলা থেকেই ঐ নাম।

দুপাশে সদ্য ছাটা চায়ের গাছ। মাঝে সরু ধাপধাপ সিড়ি। হাওয়ায় ওড়া রেয়নের আঁচল জড়িয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। ছাড়িয়ে

নিতে নিতে প্যান্ডোরা বল্লো, তো হঠাৎ করে তোমার বাগান বদল ক্যানো ?

দুর পাহাড়ের ঢেউয়ের কাছাকাছি নেমে গেছে অবেলার সূর্য। বাগানের ঢালের দিকের কমলা বনের মাথায় ওপর উড়ছে ঝাকঝাক পাখি। সেদিকে চোখ রেখে সামান্য ঠোঁট উল্টে দিল শওকত-কি জানি ক্যানো। হেড অফিস চাটগা থেকে জরুরী হুকুম এলো। রাতারাতি গুলজার খানকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে।

যাবার আগে চার্জ বুঝিয়ে দিতে এসে গুলজার খান অবিশ্যি বলেছিলো, খুব শীঘ্রি আবার সে ফিরে আসবে।

বাগানের বাবু ফিসফিসে মন্তব্য রেখেছিলো, আর ফিরেছে।

এ কথা বলছেন ক্যানো ?

চারদিকের অবস্থা দেখছেন না স্যার। ফিরতে পারলে তো ফিরবেন। যাই বলেন উনি যাওয়াতে আমি অন্তত খুশী। উর্দুমুর্দু ভালো জানিনা। ঠোঁটে ঠোঁটে খালি ঠোক্কর। আপনি বাঙ্গালী বস এলেন কথা বলে আরাম পাবো।

এ্যাই কি ভাবছো?

প্যান্ডোরা বল্লো, নো ভাবাভাবি। তোমার এ বাগান আগের চেয়ে অনেক বড়ো।

উম্। সুযোগ সুবিধাও অনেক বেশী। কিন্তু ঢেকী স্বর্গে গ্যালেও কি তার জন্য নিয়ম ভাঙ্গে? প্রমোশন যাই হোক তিন তিনটি বছর পার না হলে তোমাকে নিতে পারবো না নিজের ঘরে।

মন খারাপ করো না। এটা মার্চ। মাঝে মাত্র একটি মাস এপ্রিল। মে-তে তুমি ফ্রি। জুন এ আবার

আমি আসছি এক্কেবারে চিরকালের জন্য।

না জানি সে কতো যুগ পরে।

ধাৎ কি যে সব বলো না অলুক্ষণে কথা।

সাধে কি ? প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে আমি ভীষণ হাপিয়ে উঠেছি জানো। বিশেষ করে এই অফ সিজিন অসহ্য। তাছাড়া সোসাইটি বলতে এক অফিসার ক্লাব। বাকি সময় অন্ধকার।

বৃটিশ আমলের কট্টর স্ট্যাটাস কনশাস ব্লু-ব্লাড ম্যানেজারের এখনো নাক উচা?

এখনো। বেশ দুরত্ব নিয়ে চলেন। শুধু ওরাই বা ক্যানো। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ থেকে যারা আসে, মুখে যতো ভাই ভাই জাহির করুক ব্যবহারের ফারাক ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝতে পারে।

রাখো তো এমন বিকেলে ওসব কথা। তার চেয়ে বলো জুনে বিয়ের পর তোমাদের কোম্পানী আমাদের কি সুযোগ দেবে।

প্রথম ওয়েস্ট পাকিস্তানে বেড়ানো। দ্বিতীয় ইউরোপ।

কি মজা।

অতো লাফিও না। তার জন্য চব্বিশটা মাস অপেক্ষা করতে হবে।

ওমা মোটে দুবছর। চোখের পলকে পার হয়ে যাবে।

ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে লাইনটা শেষ করে তক্ষুনি আবার কথা বলে প্যান্ডোরা-এ্যাই এত্তো সিঁড়ি ভেঙ্গে পা ধরে গেছে। বসি একটু।

সন্ধে হতে কিন্তু দেরী নেই।

তাতে কি হলো?

শওকতের দুহাটুর ওপর মাথা রেখে প্যান্ডোরা সুর করে বল্লো, হে টি গার্ডেনের রাজেশ্বর, তোমার রাজ্যে রয়েছি ভয়টা কিসের।

শওকত মুখ নামিয়ে প্যান্ডোরার চোখ দেখলো। উজ্জ্বল। প্রত্যাশী। দুধারে ঘন চা গাছের সবুজ বেষ্টনী। আকাশে সূর্য ডোবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা রং। বুনো ঘ্রানে ম ম করা উদাসী বেলা। এমন বেলায় মধুর একটু আদর করা যায় প্যান্ডোরাকে। কিন্তু এতো কাছে থেকেও কোথায় যেনো দুর্ভেদ্য দেয়াল। চা গাছের চিরল চিরল ফাকে ফাকে জেগে আছে বাগানের জংগল, জলাভুমি, বাঁশ বন। ওর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে একটা খরস্রোতা পাহাড়ী ধারা। কুলি কামিনরা প্রায়ই কাছিম ধরে। ধরে ফেলে রাখে শিমুল গাছ তলায়। সব কটাকে চিৎ করে রাখা। বাগানের বাবু ওদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলেছিলো, স্যার ঢাকার খবর বড্ড গরম। মুজিব ইয়াহিয়া আলোচনা ফল করেছে। হাওয়ার ডগায় নানা কথার গুঞ্জন। স্যার ঐ কচ্ছবগুলোকে উলেটা করে দিয়ে যেমন ওদের চলার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, শুনছি আমাদের বাঙ্গালী পুলিশ ভাইদের তেমনি ভাবে নিরস্ত্র করে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে দেওয়া হবে।

এ্যাই কি হয়েছে তোমার বলো তো।

একরকমের অসহ্যবোধ থেকে গলা খুললো প্যান্ডোরা। শওকত লজ্জিত হলো। সেই সঙ্গে মনে মনে এও ভাবলো চারদিকের এমন থমথমে পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে হুট করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি প্যান্ডোরার।

উম্ বুঝলাম আমায় পেয়ে খুশী হওনি। ভাইয়াকে ভাবী পাঠালেন মাজার জিয়ারতে। আমি ভাবলাম দুদিনেরই তো ব্যাপার। যাই ঘুরে আসি তোমার কাছ থেকে। আরও ভাবলাম এই হঠাৎ পাওয়ার আনন্দে তুমি একেবারে পরা হয়ে যাবে।

কি হয়ে যাবো?

পরা পরা। মেয়েরা যদি আনন্দে পরী হয়ে উড়তে পারে, ছেলেরা ক্যানো পারবে না পরা হয়ে উড়তে।

ঠিক আছে। দ্যাখো আমিও পরা হয়ে গেছি।

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এক নিঃশ্বাসে নেমে গ্যালো মেলা ঢালুতে। চেচিয়ে বল্লো, উড়ে নামলাম। এবার তুমি পরী হও।

ধ্যাৎ চারপাশে ছেড়া ছেড়া পাতলা আঁধার। আমার শরীর ছমছম করছে ভয়ে।

বলেই দুহাত হাওয়ায় ভাসিয়ে চপল উল্লাসে অনভ্যস্ত পায়ে হোচোট খেতে খেতে নীচে নেমে এলো প্যান্ডোরা। শওকত জীপের বনেটে পিঠ সাটিয়ে সিগ্রেট ধরাচ্ছে। বল্লো, তোমার আগমনকে স্বাগতম জানানোর জন্য আর কি কি করতে হবে ম্যাডাম।

ডিনারের পর নাক ডাকালে চলবে না। নিখাদ দুটো পর্যন্ত গল্প।

তোমার ভাইয়া কি মনে করবেন।

কিছু মনে করবেন না। বরং তাস খেল্‌লে তিনিও যোগ দেবেন।

আচ্ছা জাগবো দুটো পর্যন্ত। পরের হুকুম ?

কাল কোথাও বেড়াতে যাওয়া।

যো হুকুম।

শওকাত সিগ্রেট ফেলে বল্লো, এসো।

কোথায় ?

গাড়ীতে তুলে দেই। তোমার সঙ্গে কবে একটা চুক্তি হয়েছিলো না যতোবার জীপে উঠবে কোলে করে সীটে তুলে দিতে হবে।

কি মিথ্যুক কি দুষ্টু তুমি।

প্যান্ডোরার কথার ভেতর দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ড্রাইভিং সীটের পাশের আসনে বসিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং ধরলো শওকত।

সন্ধা ঘন হবার আগেই বাংলো এসে গ্যালো। কয়েক বিঘা জমির ওপর দেয়াল ঘেরা সাহেবী আমলের দোতলা বাড়ী। লাউঞ্জে বসে কাদের। গাড়ী থেকে নেমে প্যান্ডোরা বল্লো, মাজার জেয়ারত হলো ভাইয়া।

হ্যারে খুব তৃপ্তি পেয়েছি এবার এসে।

ভাইবোনকে কথার ভেতর রেখে ওপরে উঠে এলো শওকত। বেডরুমের চৌকোণ আয়নায় হাফপ্যান্ট পরা সুরত দেখে খুব একচোট হাসলো। এই পোশাকে এতোক্ষণ প্যান্ডোরার সঙ্গে কেটেছে ভাবতে হাসির মাত্রা আরও বাড়লো।

বাথরুম থেকে বেরুলো রাত জাগার মতো ঢিলেঢালা পাজামা আর সিল্ক পাঞ্জাবী পরে। প্যান্ডোরা পারফিউম পছন্দ করে। হাল্কা করে মেখে এলো খাবার টেবিলে। প্যান্ডোরা নেই। শুধু কাদের বসে। চেয়ার টেনে নিতে নিতে বল্লো, কি ব্যাপার কাদের ভাই একা ?

এই তো হয়। তখনি বলেছিলাম আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ড্রাইভ করতে চাস্‌নে।তো শুনলো একগুয়ে জেদী মেয়েটা। এখন না খেয়ে খালি পেটে ঘুমিয়ে গ্যাছে। বলছে বডড ক্লান্ত।

অমি একবার ডেকে দেখবো?

সর্বনাশ ! অমন কর্মটি ভুলেও করতে যেওনা ব্রাদার। ঘুম নয়তো চণ্ডাল। ডাকতে গ্যালে মার ফায়ার।

তাই বলে—

আহা কাতর হচ্ছো ক্যানো। নিজের দোষে নিজে ভুগছে তুমি আমি কি করবো। নাও শুরু করো। আমি আবার খাবার সামনে নিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না।

কাদের ভেজিটেবল সুপের বাটি টেনে নিলো। অনিচ্ছার ভেতর শওকতও। খাবার সময় কথাবার্তা বলাটা খুব একটা পছন্দ করে না কাদের। ভোজন বিলাসীদের যেমন হয়। আড় চোখে দেখতে দেখতে এক ধরনের টান অনুভব করলো। নির্বিরোধী ভালো মানুষ। বড়ো চাকরী। সুন্দরী বাধ্য স্ত্রীর সঙ্গে চারজনের ছোট্ট সংসার। জীবনের নানা মোড়ে রকমারী জটিলতা ভাবতেও যেনো দুঃখ পায়। রাম পাখীর হাল্কা রঙিন পালকের মতো জীবন যাপন।এদের দেখলেও ভালো লাগে।

বেশ সকালে ঘুম ভাঙ্গলো কানের কাছে মিষ্টি অভিযোগে—ইস্‌ কি নিষ্ঠুর তুমি। একা খেলে। একা ঘুমুলে। বেচারী প্যাণ্ডোরার কথা একবার ভাবলেও না।

অপরাধ কবুল করে ওর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বল্লো, দ্বিতীয় চুমুকটা তোমার।

বয়ে গ্যাছে। কখন বেডটি খেয়ে নাস্তা পর্যন্ত করে ফেলেছি।

তবে আর কি শোধবোধ।

ঘন বাদামী লিকারে ঠোঁট রেখে কয়েক পলক দেখে নিলো প্যান্ডোরাকে। এরই ভেতর গোশল সেরে,ফিরোজা শাড়ী, হাল্কা প্রসাধনে ঝকঝকে তাজা।

নিজে তৈরী হতে সময় নিলোনা। সামনে ময়ালের শরীরের মতো দুধলী রং পথ। দুপাশে জলা জংগল, ভাঙ্গা মন্দির, বাজার, ধানক্ষেত, নদী। ব্রিজে উঠতে প্যান্ডোরা প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছি? জাফলং না তামাবিল ?

শ্রীপুর।

সেখানে ?

বাগানের নিজস্ব বাংলো আছে। বাংলোর তলায় চমৎকার এক পাহাড়ী নদী। তোমার ভালো লাগবে।

এ্যাই এ্যাই থামাও না একটু।

একেবারে রাস্তার ধারে গোল, চৌকা লম্বা বিশাল পাথর কয়েকটা। দেহাতী এক রাখাল বৃত্তাকার মূল প্রস্তর খন্ডে শুয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিলো। ওদের দেখে লাফিয়ে নেমে গ্যালো। শওকতের বাহু

জড়িয়ে ওপরে উঠে প্যান্ডোরা প্রশ্ন করলো, কি এটা ?

ঠিক জানি না। তবে কেউ বলে জৈন্তারাজার স্মৃতি মন্দির। কেউ বলে মানুষ বলির মঞ্চ।

মুহূর্তে সময় যেনো ঢুকে গ্যালো প্রাগৈতিহাসিক কোন্ যুগের চক্রে। দুর পাহাড়, উপত্যকা, খাদের খাজ থেকে লতাপাতায় হাত পা বাধা কাদের টেনে আনা হচ্ছে। পাথুরে এই চাঁইর ওপর নানা উপাচারের মধ্যে দাঁড়ানো পুরোহিত। তার উচ্চারিত মন্ত্রে, আর বলির খড়গে সমান ধারের ঝিলিক। প্যান্ডোরা চোখ বুজলো। মুখ গুজলো শওকতের বুকে—কোথায় নিয়ে এলে ?

আমি তো আনতে চাইনি। তুমিই নামলে।

ওহ্ কি ভয়ংকর! কি ভয়ংকর!

গাড়ীর ভেতরও চম্‌কে চম্‌কে উঠতে থাকে প্যান্ডোরা। বড়ো রাস্তা থেকে ঢালুর দিকে নেমে শওকত বল্লো, সামনের দিকে তাকাও।

দুর আকাশের গায়ে মিশে তিনটা ঝর্ণা। মনে হচ্ছিলো স্থির বিপুল জমানো বরফ। পরে স্পষ্ট হলো চলায়মান পানির ধারা। এতো জীবন্ত, মনে হচ্ছিলো হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে। প্যান্ডোরা আদুরে গলায় বল্লো, এ যে স্বর্গের দৃশ্য। এ যে আকাশ গঙ্গা। আমি ওর কাছে যাবো।

সম্ভব নয়। এগুলো অনেক দুরে। সীমান্তের ওপারে।

ইস্।

আপশোস করোনা। ঝর্ণাগুলো ওদের, পানির নহর কিন্তু আমাদের।

সত্যি ?

উম্ আমরা সেখানেই তো যাচ্ছি।

কি মজা।

একটু আগের বিষণ্ণ প্যান্ডোরা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। কিশোরী চাপল্যে বল্লো, ক্যানো যে শুধু পড়াশোনা নিয়ে কাটালাম। ক্যানো যে গান শিখিনি। কি যে গাইতে ইচ্ছে করছে না।

ততোক্ষণে লতাপাতা, কাঁটাগাছের ঝোপ, অসমান পাথুরে পথ ডিঙ্গিয়ে জীপ একটা পার্বত্য নদীর ধারে। গাড়ী ভালো করে থামার আগেই লাফিয়ে নেমে বালুতে একটা রাম গড়াগড়ি খেলো প্যান্ডোরা। শওকত ছুটে গ্যালোনা। গাড়ী ঠিক মতো পার্ক করার ছলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো হৃদয়ের জীবন্ত বাসনাকে। এলোমলো, বিব্রত, লাজেরাঙ্গা রমণীকে।

কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালো প্যান্ডোরা বা হাতের তালু তুলে ধরে বল্লো, দ্যাখো কেমন ছিলে গ্যাছে।

মন্ত্র দিয়ে এক্ষুনি ভালো করে দিচ্ছি।

শওকাত ভেজা দুঠোঁট রাখলো ওর তালুর ওপর। বল্লো, এসব জায়গায় এমন করে ছুটতে নেই।

হাঁটি হাঁটি পা পা করবো। অসম্ভব।

পাড়ের এখানে সেখানে নানা আকৃতির পাথর গোজা। হাঁটু ডোবেনা এমন ধারা পানি। টলটলে ঝকঝকে। পায়ের পাতা স্পর্শ করতেই শিহরণ জাগে সারা সত্তায়। রোমাঞ্চে আধ বোজা চোখের পাতা-আঃ এই পানি সেই আকাশ ঝর্ণার। আর .....

প্যান্ডোরা এক জোড়া বড়ো পাথর টপ্‌কে, শব্দ ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভেঙ্গে উঠলো আধডোবা একটা হল্‌দে চাঁইয়ে। ভেজা পায়ের তলায় ছোট ছোট স্রোত। চেচিয়ে বল্লো, ক্যামেরা আনোনি ক্যানো।

এনেছি।

মিথ্যে কথা।

ষোল আনায় সত্যি। চোখের লেন্সে, বুকের ফিল্মে সব তোলা হয়ে যাচ্ছে।

এ্যাই ওপার যাবো।

দাঁড়াও। একলা যেতে পারবে না।

পারবো। এই তো হাত চারেকের রাস্তা।

বলতে গ্যালে ঝাপ খেয়ে নামলো প্যান্ডোরা। অপর পাড়ের বালিয়াড়ি, কাশ ঝোপের মতো পাতলা ঝোপ, উচু স্থলপথ চোখের কাছাকাছি। কিন্তু পানির তলাটা অসমতল। অসংখ্য রঙ্গিন পিছল পাথরে বিপজ্জনকও। স্বস্তিমতো চলা দায়। শওকত এগুচ্ছে না। হাসছে। প্যান্ডেরা ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, কি অসম্ভব পাষন্ড তুমি।

সেই থেকে কতোবার গাল দিলে। অথচ কথা শুনবে না এককুনিও।

এমন প্রকৃতির কাছে এলে কেউ কি কথা শোনার মুডে থাকে।

প্যান্ডোরা হাত বাড়িয়ে দিলো। শওকত পানিতে নেমে হাত এবং কাঁধ একসঙ্গে ধরলো।

এপারের রোদ ঝলমল বালির ওপর অগুন্তি রঙ্গিন পাথর ছড়ানো। কুড়িয়ে কুড়িয়ে আঁচল বোঝাই করে এক সময় সব ফেলে দিয়ে আবার এগুলো। বাঁক ঘুরতেই জলের ধারা চওড়া, স্রোতসংকুল। মাঝে বৃত্তর মতো তৈরী হয়েছে ফোয়ারা চেহারার জলোচ্ছাস। ফুটন্ত বরফের কদম ফুল ঘেষে কাঁটালতরঙ্গ। বেলা ভূমির চিকন বালিতে পায়ের চাপ আঁকতে আঁকতে প্যান্ডোরা বল্লো, এটা যেনো আদি পৃথিবী। আমরাই প্রথম পা রাখলাম।

খুব বেশী এগিও না। সামনে জংলা জমি।

কি হবে ? ওর ভেতরে থেকে আদিবাসীরা বেরিয়ে ধরে নিয়ে বলি দেবে ?

হাসি নয়। সীমান্তের এই এলাকাটি নিয়ে কিন্তু মজার একটা

কথা চালু আছে। মেয়ে নয় এখান থেকে খোয়া যায় ছেলেরা। বলির জন্য নয়। আদিবাসী কুমারীদের মনোরঞ্জনের জন্য।

যাঃ যতো বাজে ক.....

বাকী শব্দটা জীভে আটকে গ্যালো। কুণ্ডলীতোলা পানির ওধারে নল খাগড়ার মতো ঝোপ। আড়ালে কিছু মানুষের আনাগোনা। যেনো ওদের আত্মগত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভুইফোঁড়ের মতো এই মাত্র উদয় হলো। প্যান্ডোরা কেঁপে উঠলো ভয়ে-ওরা কারা?

আদিবাসী নয়। কিন্তু এসময় এমন করে নদী পার হচ্ছে ক্যানো।

এগিওনা প্লিজ। বলা যায় না কি ওদের মতলব।

খারাপ আর কি হবে। সঙ্গে দেখছো না ছানাপোনা।

ঝোপঝাড় পেছনে ফেলে এগিয়ে এলো। ছোট একটা দল। প্রত্যেকের চোখে মুখে আতংক। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর। শওকত প্রশ্ন করলো, আপনারা কারা?

এখানকারই মানুষ বাবা।

কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বর্ডারের দিকে ক্যানো?

বাবা কি খবর শোনেননি?

কি খবর?

কাল রাতে ঢাকা শহর পাঞ্জাবী মিলিটারীরা মিস্মার করে দিয়েছে। কিচ্ছু নেই নাকি সে শহরের। এখন ওরা অন্য বন্দর নগরগুলো ধ্বংস করতে আসছে।

যে বৃদ্ধ দম নিয়ে নিয়ে কথাগুলো বলছিলো' তাকে তাড়া দিলো এক যুবক –এক দন্ড জিরিয়ে কথা বলার সময় নেই কাকা। হাঁটা দাও।

দুপেয়ে মানুষ নয়, চারপেয়ে ভয়ার্ত প্রাণীরা যেনো আচড়ে খামচে উঠে যাচ্ছে পথহীন পাহাড়ী পথে। মুহূর্ত কয়েক কিছু না বোঝার মতো বিহবল স্থবিরতা। তারপর শওকতের প্রশ্ন-তুমি না কাল এলে ঢাকা থেকে?

ঘাবড়ানো ভঙ্গিতে প্যান্ডোরা মৃদু আওয়াজ তুললো- কালই তো।

তবে ওরা কি সব বলে গ্যালো। যাই হোক ফেরা দরকার।

প্রায় আছাড় খেতে খেতে পিছল নদী পার হওয়া। অদ্ভুত অবস্থায় বাংলোয় ফেরা। লনে দাঁড়িয়ে কাদের। আতংক বিবর্ণ চেহারা-তোমরা এলে? এদিকে কি সব শুনছি? কিন্তু কি করে বিশ্বাস করি নিজেদের নিরস্ত্র নিরুপায় বৃহৎ জনগোষ্ঠির ওপর পাকিস্তানীরা নিজেরাই গোলাবৃষ্টি করছে। বলো?

ওরা দুজন কেউ কথা বলতে পারে না। নিরেট-বোবা কিছু পল, মুহূর্ত। পরবর্তী কথা কাদেরের মুখ থেকে বেরুলো

গোঙ্গানোর আর্তিতে-ওরে প্যান্ডোরা তোর ভাবীর কি হবে ? ভালোয় ভালোয় এবারের বাচ্চাটা ভুমিষ্ট হয় তার মানতেই মাজারে আসা। কি হবে সেটার ? কি হবে বাকি বাচ্চা দুটোর?

প্যান্ডোরা ওকে জড়িয়ে বল্লো, ভাইয়া একটু শান্ত হও। সব এলাকায় কি আর একই রকম গোলমাল হয়েছে। শান্ত হও।

শওকত ডাকলো দারোয়ানকে-গেট লকআপ করে দাও।

তার আগে খোলা সদরে ঢুকলো দুটি তরুণ। কাধে ঝোলা। পা-ভরা কাদামাটি। শওকত অবাক-কিরে শাহনেওয়াজ তোরা ? বাড়ীর খবর কি ?

শাহনেওয়াজ জবাব দিলো, জানি না। চারদিকে নানা গুজব. গন্ডগোল। রাত আটটার ট্রেনে মা পাঠালেন তোমার খবর নিতে। কুলআউয়ার কাছে এসে গাড়ী এগুতে পারলো না। লাইন কাটা। হেটে এসেছি ওখান থেকে।

চল ভেতরে চল।

পিপাসায় গলা কাঠ। এক পেয়ালা চা সবার আগে।

শাহনেওয়াজের বন্ধু মইন কথাটা বলে তাকালো কাদেরের দিকে -আপনি এখানে কাদের ভাই !

আর বোল না কাল এসেছি। বলো তো এখানে কি আমরা নিরাপদ?

কি করে বলি। ঢাকায় যখন হত্যাকান্ড শুরু হয়েছে তখন তো মনে হয় সব জায়গাতেই হবে। সেনাবাহিনী এক জায়গায় পরিকল্পনা কার্যকরী করে না।

পরবর্তী সময় জমাট নৈঃশব্দে যেনো দম বন্ধ করা। বদ্ধ যন্ত্রনায় গোটারাত গো গো করলো কাদের প্যান্ডোরা কি হবে তোর ভাবীর ? বাকি বাচ্চাদুটোর।

ভাঙ্গা তন্দ্রার ভেতর চমকে চমকে উঠেছিলো প্যান্ডোরা নিজেও। জৈন্তা রাজার বলির মঞ্চ বারবার দেখছিলো। হাত পা বাঁধা অবস্থায় দেখছিলো নিজেদের।

পাশের ঘরে নির্ঘুম অস্থির পায়চারীতে কাটছিলো শওকতের। বাগানের বাবুর আশংকাই যে সত্যে রূপ নিচ্ছে। জানা গ্যালো কিছু কুলি কোথায় চলে গ্যাছে। বয় বেয়ারারা ঘুরছে ছায়ার মতো। ওদের একজন খবর নিয়ে এলো সারা দেশে যুদ্ধ হচ্ছে বাঙ্গালী বিহারীতে। কি হচ্ছে ঢাকা বা অন্যান্য জায়গায় জানার উপায় নেই। পত্রিকা আসেনি। রেডিও ধরেনা। যেখানেই ডায়াল করুক ওপাশে কেউ ফোন ধরেনা। যোগাযোগ বিহীন, দম বন্ধ করা চরম সময়। ছাব্বিশের সন্ধায় আচমকা বেতারে ধরা পড়লো একটা নতুন ষ্টেশন। কোরান তেলোয়াৎ শেষে বঙ্গবন্ধুর কন্ঠ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা। কাদের বল্লো, তার মানে কি দেশ স্বাধীন ?

মইন জবার দিলো, হবে। কিন্তু তার আগে গেরিলা যুদ্ধ, রাস্তা যুদ্ধ, মুখোমুখি যুদ্ধ।

এটা কি সম্ভব-কথা বলছো হে। কোথায় শিক্ষা পাওয়া পাকিস্তানী আর্মি আর কোথায় আনাড়ী অস্ত্রহীন জনতা।

কিছু করার নেই। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গ্যাছে। তবে একটা কথা ভাইয়া জনশক্তি যে দলে থাকে সে দল অপরাজেয়, ইতিহাস তাই বলে।

এলোমেলো সম্ভব অসম্ভব নানা খবর হাওয়ার মুখে। লাঙ্গাতুরার দিকে নাকি বাঙ্গালী অবাঙ্গলীর লড়াই জমজমাট। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য হেড বেয়ারাকে পাঠানো হলো। সে আর ফিরলো না। বাগানের বাবু সাতাশ তারিখে দিয়ে গ্যালো আর এক দুঃসংবাদ। এয়ার পোর্টে নেমেছে একদল পাকিস্তানী সৈন্য। তারা এগুচ্ছে মুল শহরের দিকে। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু রয়েছে মনে হয়নি শওকাতের। তবু সবাইকে জানলা দরজা বন্ধ করে চুপচাপ থাকতে বল্লো।

কাজগুলো শেষ হবার আগেই চারদিক কাপলো গুলির শব্দে। খানিক বাদে একদল সৈন্য বাংলোর সিড়িতে ছড়িয়ে বসে অভয় দিয়ে বল্লো, ডরো মাৎ ডরো মাৎ। হামলোগ পিয়াসমে হ্যায়। থোড়া পানি ডালদো।

পানি দেবার পর জানালো দুপুরের খাবার এখান থেকে খেয়ে যাবে।

শওকাত বল্লো, এতো খাবার কোথেকে পাবো।

পালের গোদা বল্লো, তুমি মানিজার আছো। তোমার কাছে সব মওজুদ থাকে। যদি না থাকে বলো আমরা তালাস করে নেই।

ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না মতলব। তবে এটা ধরা পড়লো এক্ষুনি শহরের ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছে না।

দুপুরে খাবার পর আরও জাকিয়ে বসলো। সাঙ্গপাঙ্গ কয়েকজন সঙ্গে করে ক্যাপ্টেন নীচ তলাটা দখল করে নিলো। সৈন্যরা ছড়িয়ে রইলো খানি জায়গায়। শওকত প্রাথমিক আপত্তি জানাতে একজন রাইফেল তুলে তাক করলো নারকেল গাছের মাথা। কয়েকটা ডাব ফুটো করে দিয়ে যা বল্লো তার অর্থ হুকুমের এদিক ওদিক হলে বাংলোর পানির ট্যাং ছিদ্র করে দেবে। কুলি বস্তি জ্বালিয়ে দেবে। টু ফ্যা না করলে ক্ষতি হবে না। বিশুদ্ধ পানিতে, ডায়নামোর আলোতে, কেরাসিনের ফ্রিজে, ফোনে, পর্যাপ্ত রেশন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই বাড়ীটা আপাততঃ ওদের ঘাটি।

শওকত বোঝাতে চাইলো, তোমরা এখানে থাকলে আমার কাজের ক্ষতি হবে।

রাখো তোমার কাজ। হর পাকিস্তানীর এখন একটাই কাজ, দখলী জমিন আবার দখল করা।

বেশীর ভাগ কথাবার্তা বলছে ক্যাপ্টেনের সহকারী। ক্যাপ্টেন সারাক্ষণ কানের কাছে লাগিয়ে রেখেছে ওয়ারলেস। বিকেলের দিকে

রীতিমতো হিংস্র ভয়ংকর চেহারা হলো তার। শওকতকে ডেকে রুক্ষ স্বরে বল্লো, তোমার এখানে এতো ফালতু লোকজন ক্যানো?

ফালতু একজনও নয়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো যে কোনও বাগানের ম্যানেজার তার কাজের জন্য কোম্পানী থেকে অনেকগুলো লোক পায়।

নৌকা মার্কার আদমী ঘুসে নেই তো? ইপি-আর-এর শালালোগ।

এটা মালনিচেরা টি গার্ডেনের ম্যানেজারের বাসভবন। যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

বাঙ্গালীদের জীভে বিশ্বাস নেই। আমরা পরীক্ষা করবো ।

তোমরা খামোখা এমন ব্যবহার করছ ক্যানো।

জবাবে ছুটে এলো বিশ্রী গালাগাল। জোর ধমক-যাও নিদ্ যাও। কাল দেখা যায়েগা। তালাসীও সকাল সকাল হবে।

সিড়ির মাথায় কপাটের আড়ালে আধখানা শরীর ঢেকে ঠকঠক করে কাপছে কাদের। শওকাত ভেতরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়লো। শাহনেওয়াজ শুধালো, কেমন বুঝছো ? হঠ্বে শালারা ?

না।

আমরা দুজন একবার চেষ্টা করে দেখবো।

কি ?

লড়াইর ময়দান এই বাগানতক এসে পৌছেছে। একাত্তরের শুরু থেকেই পাড়ার ক্লাবগুলো ট্রেনিং সেন্টারের কাজ করেছে। অন্ধকারে ওদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তোমার লোকজনদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিই ভাইয়া।

নারে অমন রিস্ক নেওয়া যাবে না। সংখ্যায় ওরা যাই হোক, অস্ত্রধরে প্রত্যেকে তিন হাতওয়ালা মানুষ।

জানোয়ার বলো জানোয়ার। নইলে নিজের দেশের রাজপথে কেউ ট্যাংক নামায়।

তুই জানলি কি করে ?

ঐ যে হারমাদ সারাক্ষণ ওয়ারলেস লাগিয়ে রেখেছে কানে, লুকিয়ে ওর কথা শুনে বুঝেছি।

শাহনেওয়াজ ছিলো জানালার ধারে। আচমকা তীব্র এক ঝলক আলো এসে পড়লো মুখে। সঙ্গে জান্তব চিৎকার-এতোরাতে কি তোমরা ফুসুর ফাসুর করছো?

তোরাও কি ঘুম জমা রেখেছিস আজরাইলের কাছে ?

শাহনেওয়াজের গলা চাপা পড়লো একঝাক গুলির শব্দে। হয় ভয়ে,নয় ভয় দেখাতে ফাঁকা গুলি ছুড়ছে। ঘরের একদিকে একটা মোম জ্বলছিলো। নিভিয়ে দিয়ে শওকত টের পেলো পায়ে পায়ে

তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্যান্ডোরা। কাতর গলায় বলছে, মনে হচ্ছে এটা কেয়ামতের মতো রাত। আমায় একটু আশ্রয় দাও।

ওর পিঠে হাত রেখে শওকত বল্লো, ভয় কি আমরা সবাই রয়েছি এক সঙ্গে।

খানিক বাদে আবার বল্লো, কিন্তু আমাদের আলাদা হতে হবে। তল্লাসীতে ওরা ঠিকই আসবে। ঢাকা থেকে শাহনেওয়াজ মইন এসেছে শুনলে ঠিক ভাববে নৌকার লোক এসেছে।

অন্ধকারে শাহনেওয়াজ বল্লো, পালাতে বলো না তাই বলে।

পালানোও কি এখন নিরাপদ। তোদের মিশে যেতে হবে আমার কর্মচারীদের মধ্যে। সেই পরিচয়ই তোদের আমি দেব।

না না ভাইয়া তা হয় না। তোমরা তিনজন, একজন আবার মহিলা। ওরা মাথায় উঠতে চাইবে।

প্যান্ডোরাকেও দেবো তোদের সঙ্গে। পালের গোদাটা বাড়ীতে জেনানা আছে কিনা খোজ করছিলো। যে কোনও সময় ও উঠে আসতে পারে ওপরে।

আমি তাহলে কোথায় যাবো এই রোজ কেয়ামতের মতো রাতে?

ভীষণ ভয় পাওয়া কন্ঠস্বর প্যান্ডোরার। কাদের বল্লো, তুই কোথাও যাবি না। আমার বুকে থাকবি।

মইন বল্লো, আমি একটা কথা বলতে চাই শওকত ভাইয়া।

কি কথা ?

দুষমনগুলো কদ্দিন থাকবে কে জানে। সবাই মিলে রাত জেগে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। আপনারা সবাই ঘুমুতে চেষ্টা করুন। এখন আমি জাগবো। শেষ রাতে শাহনেওয়াজ।

শাহনেওয়াজ সায় দিতে কাদের গুমড়ে উঠলো, উহু হু কি বরাত। আপন আস্তানায় আপনি বন্দী।

ওদের দুজনকে নিজের খাটে শুতে বলে একটা ডেক চেয়ারে বসলো শওকত। কার্পেটে চিৎ হয়ে শুলো শাহনেওয়াজ। গোটা দিন মাকে এক বারও মনে পড়েনি। শুধু মা ক্যানো বাবা ভাই বোনেরা..... সারা পাড়া, শহর। কেমন আছে ঢাকা শহর ? আর কখনো কি ফিরে যাওয়া হবে ? কিংবা ফিরে গিয়ে কেমন দেখবে?

রেডিওতে আজ পড়শী দেশ ধরেছিলো। গভীর সমবেদনার সঙ্গে তারা বর্ণনা দিয়েছে পঁচিশে মার্চের নারকীয় রাতের। রাজপথে শুধু ট্যাংক নামেনি। নেমেছে সাজোয়া জঙ্গী বাহিনী। জ্বলছে রাজার বাগ পুলিশ

ফাঁড়ি। দৈনিক পত্রিকার অফিস, শিক্ষাঙ্গণ, ছাত্রাবাস, বাজার, মহল্লা.....

তাদের পাড়া যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে ভরসা নুর নেওয়াজের

মতো কিছু তরুণ। সত্তরের শেষের দিকে 'বোতল বোমা' তৈরীর কৌশল ওরা শিখে নিয়েছিলো। প্রাথমিক আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কিন্তু যে ভয়াবহ বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখ থেকে বেতারে দেখেছে, স্বস্তি নেই সেই থেকে। কি হবে দেশের ? জনগণের ? কি...

হাই মানিজার দরোওজা খোলো। আমরা চেকিং-এ এসেছি...

কর্কশ কন্ঠস্বরের সঙ্গে দমাদম রাইফেলের বাটের বাড়ি। শওকত লাফিয়ে জানালার দিকে এলো— আমরা ঘুমুচ্ছি। সকালে এসো।

সবুর করতে পারবো না।

তোমরা কথা দিয়েছিলে সকালে আসবে।

বাঙালীদের সঙ্গে আবার কথা রাখারাখি কি। জলদি খোলো নইলে কপাট ভাঙ্গবো। আমরা খবর পেয়েছি নৌকা মার্কা দলের ছোকরারা ঘুসে আছে অন্দরে।

কথার ভেতর শাহনেওয়াজের হাতে কটা শব্দ লিখে দিলো শওকত আঙ্গুলের ডগা দিয়ে। প্যান্ডোরা, মইনকে নিয়ে নিঃশব্দে পেছনের বারান্দা দিয়ে ধাঙ্গড় সিঁড়ির দিকে চলে গ্যালো। শওকত দোর খুলে দিতেই একজোড়া ধারালো কিরিচ স্পর্শ করলো গলার দুদিক। বাইরে থেকে ক্যাপ্টেন টর্চ মেরে বল্লো, বাকি দুজন কৈ?

কোয়ার্টারে। ওদের একজন আমার বাটলার, অন্যজন বেয়ারা।

আমার সিপাই তোমার ঘরে আওরত দেখেছে। নিকালো ও জেনানা।

সে তো আয়া। মগরেবের আগেই ডেরায় ফিরে গ্যাছে।

পালঙ্কে ডরপুক ঐ আদমী কে?

আমার বড়োভাই।

আর কেউ নেই?

নিশি রাতে হঠাৎ এলে, তাও বলছো আর কেউ নেই।

বাঙ্গালী লোগ বহুত নখড়াবাজ আওর নিমক হারাম—

দ্যাখো আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি, যখন যা চাইছো হাজির করছি। তারপরও এসব বলছো? হিম্মত থাকে ভেতরে ঢুকে তালাস করোনা।

বড়ী তেজী আদমী মালুম হোতা। ঠিক হায় আভি আরাম করো। কাল ফির দেখা যায়েগা।

বোঝা গ্যালো রাত করে ওরা ভেতরে ঢুকতে চায়না। বুটের শব্দে সিঁড়ি কাপিয়ে নেমে গ্যালো।

শেষ রাতে তন্দ্রা যা এলো ভাংলো এলোপাথারি আর্তনাদে। বাংলোটা একটা খাটো টিলার মাথায়। সীমান্তের ঢালুর দিকে কয়েক ঘর কুলি। চালাগুলো জ্বলছে গণগনে আগুনে। শওকত নেমে আসতে ক্যাপ্টেনের চেলা নিলাজ হেসে বল্লো, আমরা

সেখানে ঠাঁই নিয়েছি, বাড়তি লোক যেখানে থাকতে পারেনা।

চলে যেতে বলতে, আমি তুলে দিতাম।

তোমার কমান্ডে আমাদের চলতে হবে নাকি ! যাও নিজের চরকায় তেল মালিস করোগে। আর শোন, আমরা দোরোজের মেহমান। তোমার এখানে দুধেল গাই আছে। ওর বাট আমাদের খুব পছন্দ। জবাই দিয়ে আচ্ছা খানা পাকাও।

দাঁতে দাঁত ঘষে শওকত বাবুর্চিখানায় এলো।বয় বাটলারের পোশাকে ওদের ভেতর নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে শাহনেওয়াজ, মইন। প্যান্ডোরা লম্বা ঘোমটার আড়ালে ছুরি হাতে সালাদ কাটছে। পাশে জহরা আয়া। হেড বাবুর্চি কাঁদো কাঁদো গলায় শুধালো, স্যার এই ইবলিসের বাচ্চারা গর্দান থেকে কবে নামবে?

কাজ করে যাও কথা বলোনা সামাদ। দেয়ালেরও কান আছে।

নিজেকে পোকা মাকড়ের মতো লাগছে। তিন দিন আগেও যে সাম্রাজ্যে ছিলো, আজ সেখানে দাসত্বের গ্লানি।

দুপুরের পর দলটার ভেতর খুব চাঞ্চল্য দেখা গ্যালো। ডাব গাছগুলো ফলশূন্য হয়েছিলো গত দুদিনে। আজ ভাঙ্গচুর শুরু হলো নীচের আসবাব পত্র। অনর্থক মুড়ি মটরের মতো গুলি ছুড়ে সৃষ্টি করা হলো ভয়াবহ পরিস্থিতি। আচমকা তাগড়া চার সিপাই গান পয়েন্টে ওপর থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো শওকতকে। একজন হোদকা হাবিলদার বল্লো, সিলেট আমাদের মুঠিতে এসে গ্যাছে। এখানে আর থাকছি না। যাবার আগে তোমাকে জান বাঁচানোর একটা মওকা দেবো। নৌকার ছৌড়া দুটোকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

বলেছি তো অমন কেউ আমার কাছে নেই।

বিশ্বাস করি না। ভেবে দ্যাখো ওরা তোমার জানবদলী।

যা নেই তার আবার অদল বদল কি।

শওকতের কথার শেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন।

কানের কাছে স্টেন ধরে বল্লো, কোম্পানীর লকারের চাবি কোথায়?

আমার কাছে নেই।

ইয়ে মিয়া শুনো সাফ সাফ বাত। সাচ বাতাদো, নেহী তো মওতকা লিয়ে তৈয়ার হো যাও।

আমার কিছু বলার নেই। তোমাদের ধকলে চাবি কোথায় রেখেছি একদম মনে করতে পারছি না।

আমরাও তার জন্য বেশী সময় দিতে পারবো না। চলো...

চারজোড়া বন্দুকের মুখে শওকতকে ওরা ঠেলে নিয়ে চললো বাংলোর পেছন দিকে। বাবুর্চি খানার পাশ কাটাবার সময় শওকত তাকালো গভীর চোখে। ওর বিষণ্ণ দৃষ্টি ছুয়ে ছুয়ে গ্যালো বন্ধ দুয়ার জানালা। যতো বন্ধই থাক সে জানে কোনও দিক থেকে

ঠিক দেখছে প্যান্ডোরা। লম্বা শ্বাস নিলো। এতো বারুদের ভেতরও কাছাকাছি পেলো প্যান্ডোরার চুলের ঘ্রাণ।

বাংলোর পেছন দিকটা ঢালু নির্জন। পাথুরে মাটি কেটে সিঁড়ির মতো ধাপ কয়েকটা। পানির ট্যাঙ্কের তলায় দাঁড় করানো হলো ওকে। শীতল রাগে গড়গড় করতে করতে ক্যাপ্টেন আবার গরজায়—এখনো বলো লকারর চাবি আর সেই দুষমন দুটো কোথায়?

শওকত আকাশের দিকে তাকায়। সামনের বিস্তীর্ণ সবুজ ভূমি। মন্ত্রের মতো পাঢ়, অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, জানি না।

কেমন মানুষ তুমি? জীবনের সঙ্গে কি মিল মোহাব্বত নেই যে এমন ঠান্ডা হয়ে আছো।

প্রশ্নটা কে করলো দেখা হলো না শওকতের। তার আগেই তার যুবক দেহ রক্তাক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়লো সিঁড়ি থেকে সিঁড়িতে।

গুলির আওয়াজে বাবুর্চি খানার দিক থেকে একযোগে ছুটে এলো শওকতের পুরো স্টাফ। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলো না। তার আগেই নির্মম ব্রাশ ফায়ারে ফ্রিজ হয়ে গ্যালো একসার চলন্ত মানুষ।

চিলে কোঠা থেকে সেই দৃশ্য দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতেও দেয়াল আকড়ে দাঁড়ালো কাদের। শওকতের কর্মচারীদের ছিন্নভিন্ন লাশের মধ্যে শাহনেওয়াজ মইনকে সনাক্ত করা যাচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না তারই আদরের ছোট বোন প্যান্ডোরাকে। পরনের হালকা গোলাপী শাড়ীর সঙ্গে পাকানো একদলা মাংশ শুধু।

সুবর্ণর সঙ্গে দেখা

এখানে, বহু শতাব্দী প্রাচীন দুর্গতোরণে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য দুরমনস্ক হয়ে পড়েছিলো নওশাদ। আগাগোড়া ঝকঝকে লাল ড্রেসে ঢাকা সোনালী ফিতার গাইডকে ঘিরে এক দঙ্গল কৌতূহলী মানুষ।

নীচে এককালীন টেমস্ নদীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী শুকনো প্রশস্ত পরিখা। সামনে লণ্ডন টাওয়ারের লম্বা লম্বা প্রাসাদ-চূড়া। দরোজার পর দরোজা। অতিকায় সোপান, খুদে সিঁড়ি, চত্বর, অলিন্দ, আঙ্গিনা, বাগান।

প্রতিটি ভবন ঐতিহাসিক। সবগুলোর ক্ষেত্রে রয়েছে আলাদা আলাদা কাহিনী। রাজপুরুষদের জন্মস্থান যেমন লালিত, সুরক্ষিত, রমণীকুলের নির্যাতিত জায়গাও। ঢোকার মুখেই ট্রেইটরস গেট। রূপকথার রাক্ষসের ধারালো দাঁতের মতো লোহার ফলক। এক সময় রাজদ্রোহী অপরাধীদের ডুবিয়ে মারা হতো বিশাল জলাধারে। অথবা কৌশলে টেমস্ নদী থেকে ঐ সীমানায় টেনে আনা হতো আসামীদের জাহাজ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসতো ভয়াল ভয়ংকর কাঁটাওয়ালা শিকগুলো। বন্ধ হয়ে যেতো চিরকালের জন্য বেরুবার পথ।

বিশ্বাসঘাতকের ফটক পেরুলে ব্লাডি টাওয়ার। শুনেছিলো এর ছোট্ট ছোট্ট খুপরী এঁদো ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আজও লেখা রয়েছে বহু রাজবন্দী নায়কদের নাম। তিলে তিলে মরণ যাতনা ভোগ করে শেষ মুহূর্তে যারা প্রাণ দিয়েছে গুপ্তঘাতকের কুঠার, তরবারী অথবা হাতুড়ির মুখে।

টাওয়ারের দু'মুখী সিঁড়ি থেকে দশ ঘটিকার দলটি যার যেদিকে খুসি ছড়িয়ে গেছে এরপর। নওশাদকে টানছিলো কোহিনুর। যে রত্নটির সঙ্গে শুধু রাজা-বাদশাহের সম্পর্ক, এদেশ ওদেশ যেখানেই সে থাক সাধারণ মানুষের কি আসে যায়। আশ্চর্য, বিদেশ এসে দেশজ সেই মণিটির জন্যই তৃষ্ণা অনুভব করছে। ইতিহাসপ্রেমী কোনকালেই নয়, তবু করছে।

জুয়েল টাওয়ারের কিউতে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে যখন দুর্লভ, কিংবদন্তীর পাথরটির কাছে পৌঁছুবে, সামনে শুনলো ভারী

ভরাট কণ্ঠস্বর—বুঝলে গার্ড সাহেব, এই কোহিনুর আমাদের। আমি এটাকে ঠিক একদিন নিয়ে যাবো।

অকারণে নওশাদ সিরিয়াস হয়ে যায়। শুনেছে ওটা স্পর্শ করতে গেলেই পিছলে চলে যাবে নিচের দিকে। বেজে উঠবে এলার্ম বেল। মুহূর্তে ঘেরাও হয়ে যাবে রত্নলোভী তস্কর।

বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না। গার্ড মৃদু হেসে জবাব দিয়ে দিয়েছে ততোক্ষণে—তুমি তো প্রায়ই বলো। চেষ্টা করে দেখনা একবার।

আজ না হয় কাল সত্যি সত্যি চেষ্টা করবো।

বক্তা মানুষটা পাগল, সেয়ানা, শয়তান, নাকি চটকদার কথা বলে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণপিয়াসী? গালের যে দিকটা দেখা যাচ্ছে, রং-এর জৌলুস বলে দিচ্ছে এদেশী নয়।

বৃত্তের বাইরে এসে নওশাদ অবাক। সুবর্ণ যে ! অনেক কাল এদেশে। এক সময় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। তারপর বহুদিন খবর জানেই। সবাই ধরে নিয়েছিলো আগাগোড়া ওর যেমন সাহেব সাহেব ভাব, তাদের সঙ্গে মিশে আগ্রহ হারিয়েছে দেশের ব্যাপারে। সেই সুবর্ণর সঙ্গে হঠাৎ এমন করে দেখা হবে নওশাদ ভাবতে পারেনি। ওদিকে হাত বাড়িয়ে হাত নয়, কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে সুবর্ণ—আরে তুই কবে এলি? কদ্দিন থাকবি?

দু'সপ্তাহ।

উঠেছিস কোথায়?

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ আবার বল্লো, আমার ওখানে ক্যানো আসিসনি?

চমৎকার অভিযোগ। তোর ঠায়-ঠিকানা জানি কিছু ! সেই কবে থেকে ভোকাট্টা।

তাও তো ঠিক। মনেই থাকে না, প্রায় শেকড়ছাড়া মানুষ একটা।

কথার মধ্যে ওর চোখের দিকে তাকালো নওশাদ। শেকড় শক্ত হয়েই এখানে আছে জানে। খেয়ালী স্বভাব। আবার কিছু করে বসে আছে কিনা কে জানে? কামেলা, বাচ্চারা ভালো আছে তো?

সুবর্ণ তখন বলছে, চল চল। ছুটির দিন। ছাড়ছি না তোকে।

কিন্তু আমার যে টাওয়ার পুরো দেখা হয়নি।

কি দেখবি ইংরেজদের বর্বর কীর্তি? পুরো টাওয়ার ঘিরে যতো বীভৎস রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের নমুনা। শুনলে গা ঘিন ঘিন করে, দেখলে বমি আসে।

তোকে কিন্তু আমি ওখানেই পেলাম।

ওখানে নয়। বল কোহিনুরের কাছে। প্রায়ই আসি। শুধু ওকে দেখতে। ওর ভেতর দিয়েই যেনো পলকের জন্য হলেও দেখতে পাই দেশকে। ফিরে পাই কৈশোরের সোনালী সময়।

গাড়িতে স্টার্ট নিলো। অন করলো টেপ রেকর্ডার। ক্যাসেটে আবদুল আলীমের ভাটিয়ালী। চওড়া রাস্তার দু পাশে অভিজাত বিপণীকেন্দ্র। ফুটপাথ ভরে মিনি, ম্যাক্সি, সুট -বুট, পাঞ্জ, আধা পাঞ্জ ফ্যাশানের সঙ্গে কেমন বেমানান নওশাদের কানে। দেশে থাকতে যেমন মনে হতো রেল লাইনের বস্তির পাশের সেমী পাকা সুবর্ণের বাড়িটাতে দ্রুত লয়ের কড়া বিদেশী মিউজিকগুলোকে।

সামনে নেলসনের কলাম ! দেখেছিস ?

এখনো হয়ে ওঠেনি।

ওর কাছাকাছি কিংবদন্তীর সোহো সেখানেও যাস্‌নি নিশ্চয়। প্রোগ্রাম করে একদিন আয় নিয়ে যাবো। যদিও আগের সেই জৌলুস কিছু নেই।

গাড়ি চলছে শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে কুইন্স গেটের দিকে। নওশাদ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলো, কি করছিস এখন ?

তেমন কিছু নয়।

পড়াশোনাটা শেষ পর্যন্ত মুলতবীই রেখে দিলি ?

কি করবো ডক্টরেট করে ! এদেশে এগুলোর দাম আছে?

অচেনা হাসি গোঁফের কাছে রেখে বল্লো, চুল ছাঁটতে গিয়ে যেদিন দেখলাম সেলুনওয়ালার পিঠে ঐ ছাপ, ঘেন্না ধরে গ্যালো। দরে কদরে তাই বুঝি আর বনলো না একসময়কার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে।

একটু ভয়ে ভয়ে নওশাদ বল্লো, পড়াশোনার সাথে জীবিকার খুব কি সম্পর্ক আছে? আমি তো দেখছি এদের কাজকর্মের সঙ্গে ডিগ্রীর যোগরক্ষা সব সময় হয় না। পড়ালেখাটা জানাবোঝার খাতিরেই করে।

সুবর্ণ বাঁকা চাউনী দিয়ে বল্লো, নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষ এখানেও আছে।

ভাই আমি দু'দিনের রাঁধুনী, ভাতকে অন্ন বলার, তর্ক করার জোর রাখি না। সামান্য দেখার কথা বল্লাম।

তাহলে সামান্য দেখার এটুকুও জেনে যা, বিবেচনা বুদ্ধিতে ওদের চেয়ে কোনো অংশে আমরাও কম যাই না। তবু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের গ্লানি নিয়ে খাটো হয়ে থাকতে হয়। প্রমাণের পরও উপযুক্ত কাজ পেতে গলাধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

তাহলে থাকিস ক্যানো এখানকার মাটি কামড়ে?

ঝট করে লাইনটা উচ্চারণ করে শংকিত হলো নওশাদ। এতোটা মূলে আঘাত করাটা বোধহয় ঠিক হলো না। কিন্তু সুবর্ণ হয় কথাটা গায়ে মাখলো না, নয় না শোনার ভান করে মোড় ঘুরে এসে দাঁড়ালো একটা বাড়ির কাছে। সামনে ফুটপাত। দু'পাশে ছোট্ট চৌকোণ জমি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছা বেশি। কোণে জড়ো করা বাথরুমের রকমারী পরিত্যক্ত সামগ্রী।

বেল পুশ করতে দুয়ার যে খুলে দিলো সেও অচেনা নয়। কামেলা। হাউস কোটের ওপর দেশী কায়দায় কাঁথা জড়ানো-ঠাণ্ডাটা আজ একটু জমকালো, নয় ?

সুবর্ণর কাঁধের দিকে চোখ পড়তে প্রায় চেচিয়ে বল্লো, আরে আমাদের নসু না? কি তাকিয়ে আছো ভ্যাবলার মতো ? চিন্‌তে পারছো না !

নওশাদ অজান্তে ঢোক গিললো। চিনতে না পারার মতো পরিবর্তন ওর মধ্যে তেমন ঘটেনি। খটকা লাগাচ্ছে চোখ। ঢাকার অভিজাত ধনী পরিবারের ফ্যাসনবল মেয়েটিকে ঠিক এভাবে আশা করেনি। হেসে বল্লো, তুমি যে চিনতে ভুল করোনি তাতেই আমি পুলকিত। কি যে আরাম লাগছে।

আরাম ক্যানো ?

অখুশি হওনি। ন্যাটিভ ভেবে ভুরু পর্যন্ত কোচকাওনি।

কি যে বলো না ছাই। বিরক্ত ক্যানো হবো।

দেশী লোকদের ওপর তোমরা দু'জনই ভারী বিরূপ ছিলে তো।

সেতো কোন এক আগের জন্মের কথা।

সত্যি সত্যি সে যেনো আর একটা জীবন। ভেতরে ঢোকা থেকে নওশাদের বারেবারে মনে পড়ছে। শুধু অন্য জীবন নয়, প্রায় অবিশ্বাস্য এখনকার বাস্তবটাও। ড্রইংরুমের জানালায় চিকন নেটের পর্দা। কৌণিক সোফা সেট। নয়নসুখ কার্পেট। দেয়ালে একটি মাত্র লম্বা ছবি। সেটা পুরোন সাদা শাড়ির ওপর কাঁথার বুনুনে রঙ্গিন সুতোর কারুকাজ। একদিকে বহুবর্ণের একটা বেঢপ হাতীর শরীর। কাছাকাছি একঝাঁক ছানাপোনা নিয়ে একটা মুরগী। দানা হাতে উবু অবস্থায় বসে এক গ্রামের বধু। পেছনে চিল্‌তে কুঁড়েঘরের চালচিত্র। একেবারে কোণঠাসা হয়ে কাঁচা অক্ষরে লেখা 'আমিনা'। দেখেই বোঝা যায় বাংলাদেশের অখ্যাত পল্লীর অশিক্ষিত অশিল্পী আমিনার কুটির শিল্প একদা হাত ঘুরে ঢাকা শহরের অভিজাত দেশজ শিল্পালয়ে উঠে এসেছিলো। সেখান থেকে চড়া দামে, উড়োজাহাজে চড়ে এখন এই ড্রইংরুমের বিশেষত্ব।

সেখান থেকে নওশাদের চোখ গ্যালো দ্বিতীয় বার কামেলার দিকে। বয়কটি চুল। বানানো রংদার মুখ। কৌশলে আয়ত্তে আনা রোগা রোগা শরীর। কামেলা হেসে দিয়ে বল্লো, উম্, তুমি দেখছি এখনো বোকদা প্যাটার্নেই রয়ে গ্যাছো। যেমন ছিলে ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে। তো এমন করে কি দেখছো ?

তোমাকেই। কাঁথাটা বোকা চোখে বড্ডো টাটাচ্ছে কিনা।

তা টাটাক। এই মিঠে শীতে কাঁথার মতো আরামের আর কি আছে।

ছেলেমেয়েরা কোথায় ?

রুশদী গ্যাছে স্কুলের সঙ্গে এস্কারসনে। ঝিনুক এখানেই তো ঘুর ঘুর করছিলো।

চিন্টুর সঙ্গে আজ না ঈদের নাটকের রিহার্সালে যাবার কথা ওর ?

টাইএর নট্ আলগা করে পা ছড়িয়ে বসতে বসতে প্রশ্ন রাখলো সুবর্ণ। কামেলা জবাব দিলো, চিন্টুদের বাড়িতে আজ খুব গণ্ডগোল চলছে।

ওর ড্যাডি বুঝি আবার বেশি রাতে মাতাল হয়ে ফিরেছে?

না বাড়িতে বসেই ওর মাকে বেদম পিটিয়েছে। এ দেশের সরকারী সুবিধা সোস্যাল সিকিউরিটির ভরসা নিয়ে যারা টিকে থাকতে চায় তাদের এমনি হয়।

কি বলতে চাও তুমি ?

সুবর্ণর চোখ-মুখ ভীষণ পাল্টে গেলো আতঙ্কা। কথা নয়, এ যে প্রায় ক্ষ্যাপাটে চিৎকার। কামেলা নির্বিকারে ঠাণ্ডা চোখের ঝাপটা দিয়ে বল্লো, লাঞ্চ টাইমে ষাঁড়ের মতো চেঁচিও না। দপ করে আমিও জ্বলে উঠবো। যাও নওশাদকে বেশিন দেখিয়ে দাও। হাত-মুখ ধুয়ে আসুক।

সুবর্ণ নওশাদের দিকে তাকিয়ে খানিকটা নিভে যাওয়া ভঙ্গিতে বল্লো, চল।

ক্যানো ঝামেলায় যাচ্ছিস। ওসবে কিছু দরকার নেই। যেখানে আছি সেখানে আজ ডিম খিচুড়ি। তুই বরং টিউব স্টেশনটা কোনদিকে আমায় বলে দে।

নওশাদের কথার পিঠে কথা বল্লো কামেলা, সময়ে সেটা তো নিশ্চয় হবে। কিন্তু তুমি নটি বয়, ভর দুপুরে এসে না খেয়ে চলে যাবে, এমন রীতি বাঙ্গালীরা পালন করে না। যাও যাও ওর সঙ্গে যাও।

স্বামী-স্ত্রী একজোট হয়ে নওশাদকে পাঠিয়ে দিলো দোতালার বাথরুমে।

ফিরে আসতে দেখে সিঁড়ির মুখে একটি কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে। হেসে বল্লো, আমি ঝিনুক। আমার সঙ্গে আসুন আংকেল।

ড্রইংরুম লাগোয়া ডাইনিং স্পেস। লাঞ্চের ব্যবস্থা বাইরে। ঝকঝকে রোদ আজ সকাল থেকে। পেছনের কিচেন গার্ডেনের মাটিতে চাদর বিছানো। সুদৃশ্য পাত্রে টার্কির রোস্ট, গরম তন্দুরী, ফলের রস, সালাদ, আচার, কোকের বোতল সাজিয়ে বসে কামেলা। ওর কাঁধের দিকের দেয়াল বেয়ে গোছা গোছা মওসুমী গোলাপ। এপাশে সুইট সুলতানের বেগুনী গুচ্ছ। একটু তফাতে ফলবন্ত আপেলের গাছতলায় কফির সরঞ্জাম ঠিক করছে ঝিনুক।

পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে ঝরা টকটকে ফল কয়েকটা।

দৃশ্যটা নওশাদের চোখে না দেখা স্বর্গের মতো। ফুল নয়, ফলের মিহি মিষ্টি সুঘ্রাণে ভরা নিঃশ্বাস নেওয়া বাতাস। কাকহীন, কীট-পতঙ্গহীন নির্ভয় জমি। নিষ্পাপ নিরোগ কিশোরী, স্বামীর শরীর ঘেঁষে সুদর্শনা স্ত্রী। স্ত্রীকে সাহায্য করা সুবাধ্য পতি।

সুবর্ণ ছুরি বাগিয়ে রোস্ট কাটতে বৌকে সহযোগিতা করছে। পেয়ালা-পিরিচ মুছে দিচ্ছে। খেতে খেতে খোঁজ নিলো ঢাকার রাস্তা ঘাটের। গাছপালা কাটার জন্য আপসোস জানালো। শহরের সুন্দর সুন্দর লেকগুলো আছে না বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুঃখ করলো বহু বছর আগের বুজিয়ে দেওয়া দোলাই খাল নিয়ে। বল্লো, অথচ এখানে দ্যাখ, টেমস্‌কে কেমন করে কাজে লাগানো হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পার হলে দেখ্‌বি ফরাসীরা মুল শহরের মধ্যে কেমন বেঁধে রেখেছে সীন নদীকে।

নওশাদ ঠোঁটের কোণের ঝোল ন্যাপকিনে মুছে মৃদু গলায় বল্লো, গরিব দেশ আমাদের ভাই।

শুধু দেশ ক্যানো। মানুষগুলোও। মন থেকে এতো মীন, দুনিয়ার আর কোথাও পাবে না। পথঘাট স্বাধীনতার এ তো বছর পরও শুনছি নিরাপদ নয়। রোজগার বাড়েনি, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে আগুন। বাইশ পরিবারের জায়গায় এখন নাকি দুশো পরিবার ধনী। মাঝে মধ্যে দেশের জন্য মন কেমন করে না, তা নয়, করে। কিন্তু ঐসব ভেবে আর উৎসাহ পাই না।

স্থায়ী না হোক দু'একবার বেড়াতে গেলেও তো পারিস।

কি করে পারবো? বিশ্রী গরম, মশা মাছি ধুলা। ইদানীং নাকি পানি, বিদ্যুতের ঘাট্‌তিও মারাত্মক রকমের।

স্বামীর হয়ে কথা বল্লো কামেলা—তাছাড়া রাজ্যের যতো ভেজাল খাবার। ঐসব খেয়ে দেশ সুদ্ধ মানুষ কি করে যে বেঁচে আছে ভাবলে অবাক লাগে।

ঐ এক রকমের বেঁচে থাকা আরকি।

সুবর্ণ যে ভঙ্গিতে, যে আওয়াজে স্ত্রীকে সাপোর্ট দিলো নওশাদের কানে পরম অনুকম্পার মতো শোনালো। স্বাদু খাবারের স্বাদ পান্‌সে হয়ে গেলো কেমন। তবু অস্বীকার করতে পারলো না ওদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। মনকে চোখকে প্রশান্তি দিচ্ছে।

সম্ভবত তারই প্রত্যাশায় ও বাড়িতে নওশাদের দ্বিতীয় বার যাওয়া। দেখানো কারণটা যদিও অন্য রকম। পরদিন সকালের ফ্লাইটে ফিরে আসবে। তার আগে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ।

এই যাওয়াটা না গেলেই বোধহয় ভালো হতো, পরে মনে হয়েছে নওশাদের। রাত আটটা। লণ্ডনের সূর্য তবু বহাল তবিয়তে। পথের আলোগুলো যেনো অর্থহীন জ্বলে থাকা।

বেল টিপতে ঝিনুক দরোজা খুলে বসতে বল্লো। নওশাদ জিজ্ঞেস করলো, তোমার আব্বা-আম্মা নেই?

আছেন। খবর দিচ্ছি।

ঘরে ঢোকার সময় ঝিনুকের মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। নওশাদের এখন মনে হলো এক ধরনের বিরক্তিকর নির্লীপ্তিও জড়িয়ে আছে। বল্লো, খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে। আপনার হাতে সময় আছে তো?

নওশাদ ঘাড় নাড়লো। একা ঘরে কানে এলো তুমুল কথা কাটাকাটি। শব্দটা ওপরের ঘর থেকে আসছে। এই মুহূর্তে কি একটা সিঁড়ি গলিয়ে ছিটকে এসে পড়লো নীচের কার্পেটে। নওশাদ একটু চমকে উঠলেও ঝিনুক স্বাভাবিকভাবে চলে গেলো কিচেনের দিকে। বসার ঘরের লাগোয়া দরোজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডাইনিং টেবিল। রুশদী এক কোণে বসে সুপের প্যান ওপুড় করে বাটিতে ঢালছে। রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে। দৃশ্যটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটি বাচ্চা ছেলে রাতের খাবার একাকী খাচ্ছে নওশাদের বাঙ্গালী চোখকে বুঝি অকারণে ধাক্কা দেয়।

ওপর থেকে এসময় বিরূপ স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে আসে সুবর্ণ। দাম্পত্য কলহের কোনও সূত্র ধরে বিনা ভূমিকায় গরজাতে থাকে—ভারী আমার চাকরি করনেওয়ালী হয়েছে। কি বা এমন সেলারী। সব তো পোষাচ্ছে আমার সোস্যাল সিকিউরিটির ভাতায়।

নওশাদ একটু অবাক হয়ে বল্লো, সে কি এখানে তুই চাকরি বাকরি কিছু করছিস না?

ঝাল ঝাল গলায় সুবর্ণ জবাব দিলো, এই মুহূর্তে কিছু করছি না। কি করে করবো ? আমার পিঠে ব্যথা।

একটু থেমে বল্লো, চাকরি যেমন করি না, সংসার দেখা-শোনায় পুরোসময় দিয়ে তাতো পুষিয়ে দিই। উনি ফুলবিবির মতো অফিস যান, আসেন। বাদবাকি ডিউটি আমার। তবু কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই। বারে বারে আঁতে ঘা দিয়ে কথা শোনানো। খাঁটি চাটিগায়ের ব্লাড আমার মধ্যে, অতো দেমাগ সহ্য করতে পারি না। জ্বলে উঠি।

ড্যাডি এটা তুমি কি করেছ?

ঝিনুক এসে দরোজার মাঝখানে দাঁড়ায়। হাতে ডেটল তুলার বাক্স। সুবর্ণ লজ্জিত হবার বদলে জেদি ভঙ্গিতে বলে,বেশ করেছি। আরও বাড় দেখলে মাথাই ভেঙ্গে ফেলবো।

তোমাদের এগুলো আমাদের একদম ভালো লাগে না। দিন যতো যাচ্ছে তোমরা দু'জনই যেনো ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো !

ধারালো ক্ষুব্ধ গলায় কথাগুলো বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গ্যালো ঝিনুক। ওঘরে নির্বিকার মুখে রুটিতে মাখন লাগায় রুশদী। এঘরে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ তুলতে

থাকে সুবর্ণ।

নওশাদ এমনটির জন্য তৈরি নয়। অপ্রস্তুত। অকারণে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। আরও মনে হয় প্রথম দিন সামান্য ক্ষণের জন্য ওদের স্বামী-স্ত্রীর চোখে যে আক্রোশ, পারস্পরিক ঘৃণার মতো দেখেছিলো, অসমাপ্ত সেই দৃশ্যের ধারাবাহিকতা দেখছে এখন। মাঝের আপেল-তলার লাঞ্চ আওয়ারের ঘটনাটা বুঝি মোহময়, ভ্রান্তিময় কিছু। উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বল্লো, আজ চলি।

উঠে দাঁড়ায় সুবর্ণও—যাবি, যা। এখানে বসে শুধু তো স্বপ্নভঙ্গ।

রাস্তায় এসে নওশাদ চাপা নিঃশ্বাসে বল্লো, সুবর্ণ তুই আমাদের বড়ো আশার মানুষ ছিলিরে।

ভাওটা কি ভেঙ্গে ফেলেছি? বল্লাম না আমার এখন অসুস্থকাল চলছে। পিঠের ব্যথা। বিশ্বাস হয়নি, না? বুঝেছি।

কি বুঝেছিস্?

বাঙ্গালীদের সঙ্গে থাকিস, খারাপ দিকগুলোই তো আগে শুনবি। এখানে মেলা নেটিভ ইচ্ছে করে কাজ করে না। ইচ্ছে করে রোগী সেজে থাকে। পিঠের ব্যথার কোনও ডাক্তারী প্রমাণ নেই। সেই রোগেই তাদের ধরে। তুই ভেবেছিস আমিও সেই দলে? ভণ্ডামি করে সরকারী পয়সা লুটছি .....

বলতে বলতে আরও রেগে যায় সুবর্ণ। নওশাদ আর কথা বাড়াতে সাহস করে না। কেঁচো খুঁড়তে আর কিছু বেরিয়ে যাবে নাতো!

দ্রুত হাঁটে। টিউব স্টেশনটা খুব বেশি দূরে নয়।

নাগমোতির হাটে

লালে নীলে ছোপ ছোপ শেষ বেলার লঞ্চটা বড়ো নদী থেকে যখনি খালে ঢোকে, ঠিক টের পায় সারা। মাঝে একটা নতুন ওঠা কোণচে জমি—সাপের চর। কে জানে কানো এমন নাম। গাও গেরামে মানুষ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সাপও। দিনে অন্তত দু'বার ওদের সঙ্গে দেখা হয় সবার। মজা পুকুরে নাইতে গিয়ে। বৈরাগীর ভিটার শাক তুলতে গিয়ে। একবার তো বুঝতে না পেরে একটার গায়ে হাতই দিয়ে ফেলেছিলো। কি জানি ক্যানো দুধ বরণ সরীসৃপটা ফণা তুলে রুখে দাঁড়ালোনা। এঁকেবেঁকে চলে গ্যালো আরও নিবিড় ঝোপের দিকে। আচ্ছা ওরা কি মানুষের দুঃখ বোঝে? বুঝতে পেরেছিলো খারকন পাতা না সংগ্রহ করতে পারলে ভাত খেতে হতো শুধু নুন মরিচ দিয়ে।

মজা পুকুরে কবে মুক্তা পাওয়া যেতো কে জানে! ছোটো ভাই বোনদের সঙ্গে সারা অনেক সকাল দুপুর কাটিয়েছে মুক্তা খুঁজে। দুচারটা ঝিনুক জুটেছে বড়োজোর। তবে হাঁ শোল গজারের পোনা উঠেছে গামছায়। লালচে ছোটো ছোটো মাছগুলো কি যে সোয়াদের। ঝাঁক ধরে চলা পোনাদের সঙ্গে যেমন ওদের মা থাকে তেমনি পিছে পিছে ঘোরে জলজ সাপেরা। ওরাও কখনো কিছু করেনি সারাকে। গরিবের দুঃখ ওরাও হয়তো বোঝে। কিন্তু পাড়া পড়শি মানুষেরা যেনো কেমন। সে সন্ধ্যায় হাট থেকে বাবা চাল নিয়ে ফিরতে পারে না, নির্জলা উপোসে কাটাতে হয়। শরীকরাও খোঁজ নিতে আসে না চারটি নাবালক সন্তান নিয়ে কি খেলো পল্টু মৃধা। অবিশ্যি তাদেরও সব সময় দোষ দিতে পারে না সারা। ভীষণ আলসে আর বদ মেজাজী তার বাবা। গোটা বছর যার ঘরে অভাব, কে তাকে রোজ দেখবে। গ্রামের লোক তো দূরের কথা মাই-তো টিকতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

বাবা নাকি কবে পল্টনে নাম লিখিয়েছিলো। লম্বা চওড়া সেই যুবক বাবাকে তার মনে নেই কিন্তু আবছা মনে আছে সচ্ছল দিনের কথা। বাড়িতে গরু না থাকলেও বাজার থেকে এক লোটা দুধ আসতো। হাটের সন্ধ্যায় বড়ো মাছ। কুপির আলোয় মা সঙ্গে সঙ্গে বসতো মাছ ভাজতে। কম কম তেলে, বেশি বেশি মশলায় ভাজা সেই ঘ্রাণ এখনো সে অনুভব করতে পারে। মা যেমন

চটপটে বাবা তেমনি অলস। পল্টনের পরিশ্রম সইলোনা। পৈতৃক জমি জমায় খাটাখাটনি করলে অন্তত মোটা ভাত কাপড়ের টান হতো না। বাবা সেদিকে উদাসীন, একটার পর একটা ক্ষেত রেহান দিয়ে, পাড়ার বাংলা ঘরে তাস খেলে, আশপাশের গ্রামের যাত্রা, জারী, কবিগান দেখেই কাটিয়ে দিলো কয়েকটা বছর। এর ভেতর মা'র কোলে এলো দু'হালি সন্তান। চারটা মরে বাকি চারটাও যখন রোগে, অনাহারে মরো মরো মা তখন ঘোমটার আঁচল কোমরে বেঁধে ঝগড়া শুরু করলো। বাবার সেই দশাসই শরীর ভেঙ্গে দ-এর মতো। চোখ বসা। গলায় স্বর কর্কশ ভাঙ্গা। অতি মাত্রায় রাত জাগার ফল। দিনটা তো মানুষের কাজের সময়। বাবা তখন হা করে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। রাগে দুঃখে মা যখন ওদের এক সঙ্গে পাট খড়ি দিয়ে পিটায়, চারজন কাঁদে দিক দিগন্ত ফাটিয়ে, তখনো বাবা জাগে না। যদি বা জাগে অশান্তি বাড়ে দ্বিগুণ। হাতের কাছে যাই পায় মার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রূপ কথা রাক্ষসের মতো বিকট মুখ করে চেঁচায়- অয় মাগী আর যুদি চিল্লাস, হাড্ডি মাংস এক কইরা ছাইড়া দিমু কলম। থাকতে হইলে মাটি কামড়ায়া থাকবি, নাইলে যাবিগা যেখানে মর্জি।

যামুইগা।

যাবিই তো। তুই কি সতী নারী না ভালো নারী।

যার সোয়ামী ভালো না সে ভালা হইবো কেমুন কইরা। ভাত কাপুর যুদি চাইলেই খারাপ হয়, তয় আমি তো খরাপই। কিন্তুক অসতী কইওনা।

একশো বার কমু। সাপের চরের হান্নানাইনা ক্যান আসে বারে বারে ? তুই মোনে করস আমি দুধের গেদা কিছু বুঝিনা। বাবড়ি চুলে পাকন ধরলো কি বাতাসে। সব বুঝি। তর গাও গতর অখনো ট্যাট্‌কা। অভাবের কামুড় খায়াও টাট্‌কা।

কি জানি কি রহস্য কিংবা শক্ত কামড় থাকতো বাবার এই সব কথায়। মার কোমরে বাধা আঁচল শিথিল হয়ে চোখে উঠতো। নাঁকা নাঁকা গলায় কাঁদতো আর কথা বলতো, আমি ভালাই আছিলামগো। ভেজাল ছাড়া দুধের মতন খাঁটিই আছিলাম। তুমি সোয়ামী আমারে খাইবা বুঝবার পারতাছি। বুঝবার পারতাছি এইটাই আমার কপালের লিখন।

এর কয়েক দিন পরই মা যেনো সত্যি সত্যি কোথায় চলে গ্যালো। নানা বাড়ী না, খালার বাড়ী না। কেউ বল্লো, 'স্লিপ কাটা' ব্যবসায়ী সাপের চরের হান্নানের ঘরে গিয়ে উঠেছে। কেউ বল্লো লঞ্চে চরে গ্যাছে ষোল মাইল দুরের ঢাকা শহরে। ওখানে নাকি পয়সার অভাব নেই। কাজের অভাব নেই। তাই যদি হয় তবে মা কখনো না কখনো নিশ্চয় ফিরে আসবে। বাবার অমানুষিক আশ্রয় থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে তাদের চার ভাই

বোনকে।

গাজীর খাল দিয়ে রোজ কম করে হলেও ঢাকা থেকে লঞ্চ আসে আট দশটা। সকাল থেকে বিকেল অবধি সারার ঘরে নানা কাজের বোঝা। ক্ষুদ জাউ যাই হোক কিছু একটা নামাতে হয় 'আখা' থেকে। যেদিন তাও জোটে না নানা রকম শাক পাতা দিয়ে শুধু একটা ঘাটা করে। পাতে পাতে সেই পদার্থ বেড়ে দিলে ভীষণ রাগে বাবা চিৎকার করে। ভাইবোনগুলো ফোপাতে ফোপাতেও খায় পেটের জ্বালায়।

ভোর ভোর রান্না সেরে বেরুতে হয় শাপলা, শালুক, মেটে আলুর খোঁজে। পিঠাপিঠি বোন সানার ঘাড়ে থাকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহের দায়িত্ব। পরেরটা ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। দুটো হাঁস, তিনটে মুরগীর দেখাশোনা করে। একেবারে ছোট সোনা, বাবা ওকেই একমাত্র আদর করে কাছে নিয়ে শোয়, পাত থেকে এটা ওটা দেয়। পাঁচ বছরের ছেলেটার এখন থেকে ধারণা হয়ে গ্যাছে সে পুরুষ মানুষ, ঘরের কোনও কাজে তার হাত দিতে নেই। অহংকারী আদুরে ভঙ্গিতে হয় বাবার ভাঙ্গা চৌকিতে বসে থাকবে, নয় হুকুম চালাবে বোনদের ওপর।

সংসারের যাবতীয় কাজ সারতে সারতে বেলা নেমে আসে। পড়ন্ত সময়ে খেয়ে রাতে খাবার পাট থাকে না বলে বিকেলটা অবসরের। তেলহীন ফ্যাসফ্যাসে লালচে চুলে মার ফেলে যাওয়া কবেকার আধক্ষয়া চিরুনী চালাতে চালাতে কানে যায় টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ শব্দটা। এটাই শেষ লঞ্চ। বাঁশের আরা থেকে রংচটা ওড়নাটা তুলে নিয়ে সারা ছোটে। ঢালিদের জামুরা, বাতাসী লেবুর বাগান, শিকদারদের বিশাল বাঁশ ঝাড় ছাড়িয়ে খানিকটা নীচু জমি। তারপরই হাট খোলার বটে পাকুড়ে জড়াজড়ি করে থাকা লঞ্চ ঘাটা। নাগমোতির হাট। একটা জাদরেল শিমুল গাছের তলায় পাশাপাশি হয়েছে চারটা চায়ের দোকান। বাইরে পাতা তক্তার বেঞ্চটায় এক দিন বসতে গেছিলো। দোকানী তুলে দিয়েছে খদ্দের নয় বলে। আজকাল সবে গোঁফ ওঠা সেই ছেলেটাই তাকায় কেমন তেরছা চোখে। কখনো এদিক সেদিক সাবধানে নজর করে চাঁপা চাঁপা গলায় ডাকে, ঐ সারা টুলে বয়। সুবাসী তুলা তুলা নরম মোহন বিস্কুট আইছে নতুন নতুন। বইসা টেস্টো কইরা দ্যাখ একখান।

সারা যায় না। জবাব দেয় না। কিন্তু ভাঙ্গা আয়নায় ঘরে ফিরে চেহারা দ্যাখে। বয়স হলো বারো। মাজা রং ফর্সা হয়েছে কবে। এতো অভাবের মধ্যেও গোলালো হাত পায়ের গোছা। মুখটা যে ওর মায়ের মতো সুন্দর, ছোটকাল থেকেই শুনে আসছে। ইদানীং লক্ষ করছে চায়ের দোকানের ঐ ছেলেটা, মুন্সী বাড়ির তোতলা রমজান যেমন তাকায়, বাবাও তেমনি তাকায়। ঠিক এক

রকম না হলেও কোথায় যেনো ওদের চোখের সঙ্গে বাবার একটু লালাভ চোখের মিল রয়েছে।

আজ লঞ্চ ঘাটে যাবার পথে বাজারের দিকে দেখলো অনেক লোকজন। প্রতি শীতের আগে মেলা বসে। চড়ক গাছের সঙ্গে কতো রকমের সখের জিনিসের দোকান পাট। মিষ্টি আর ছড়ি ভাজার মন পাগোল করা সুবাস। এবার শোনা যাচ্ছে যাত্রাদল আসবে। দুরাত থাকবে। হ্যাজাক বাতি নয়, ওরা নাকি আসরে জ্বালাবে লাল সবুজ বিজলীর আলো। তো যে আলোই জ্বলুক কখনো ওখানে পৌছতে পারবে না সারা, সানা, নবুরা। তিন বোনের আক্ষেপ দারুণ।

লম্বা শ্বাস নিয়ে সারা দাঁড়ালো সেই হাটতলার সাইন বোর্ডটার আড়ালে, যাতে লেখা আছে এ গ্রামের নাম। শেষ লঞ্চটার টিপটিপ শব্দের সঙ্গে মিশে থাকে নিজের বুকের স্পন্দন। লঞ্চ ভেড়ে। সিঁড়ি লাগে ঘাটের সঙ্গে। দলে দলে মানুষ নামে। স্ত্রী পুরুষ, বুড়ো বাচ্চা। রকমারী পোশাকে রকমারী ঢং-এর। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবার দিকে চোখের সন্ধানী আলো ফেলে রাখে সারা।

মা গ্যাছে তিন বছর আগে। মুখ যে খুব স্পষ্ট তাও নয়। তবু ওর কেমন বিশ্বাস দেখলেই চিনতে পারবে। রক্তের টান নাকি জব্বর টান। দুনিয়া তো দুনিয়া হাশরের ময়দানেও নাকি মা সন্তানকে চিনবে, সন্তান মাকে।

যতোক্ষণ লঞ্চ থাকে, ভেপু বাজে সারা ওর সামান্য অক্ষর জ্ঞানে পড়তে চেষ্টা করে নাম। এখন যেটা এলো ওর কেবিনের কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছে সাদা জমিনের ওপর ঘন কমলা রঙ্গে লেখা 'লীমা এক্সপ্রেস'। আহা এই মেয়েটা কি ভাগ্যবতী। ওর নামে লঞ্চ চলে। চলে হাজার হাজার টাকার কাজ কারবার। এই মেয়েটা দেখতে নিশ্চয় পরীর মতো। ওর ডানে বায়ে থাকে অনেক দাসী বাঁদী। স্কুলে যায় হয়তো হাওয়া গাড়িতে চড়ে।

বুকের ভেতরে মোচড় টের পায়। এখানকার একদার জমিদার সাহেবদের দোমহলা টকটকে লাল ইটের আলিশান বাড়িটায় সম্প্রতি মেয়েদের স্কুল হয়েছে। ছাত্রীরা সকালে পড়বে। দুপুরে ছেলেরা। কতো দুরের গ্রাম থেকে মেয়েরা আসে বই খাতার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। অথচ ওদের বাড়িটা বারো চৌদ্দ হাতের মধ্যে স্কুল সীমানা থেকে। সানা এই সুযোগে এর ওর গাছ থেকে কামরাঙ্গা কয়েত বেল চুরি করে টিফিনের সময়ে ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করা ধরেছে। কাজটা ঠিক নয়, বলে লাভ হয়নি। দশবছরের সানা উল্টো সারার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। গোপনে বাবাকে আট আনা, এক টাকা দিয়ে খুশি করে একটু আধটু আদরও খাচ্ছে জন্মদাতার।

অয় গেদী আনাম রাইত পার করবি নিকি তর ঘর পলানী

রঙ্গিলা মাওর আশায়। এ্যা !

চাখানার চান্দু। তাইতো কখন ঘাট ছেড়েছে লীমা এক্সপ্রেস। লোকজন কেউ খেয়ায় চড়ে নদী পার হয়ে গ্যাছে। কেউ পায়ে হাঁটা দিয়েছে ক্ষেতের আল বা শুকনো বিলের পথহীন পথে। সেই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। কার আশায়? ঘর পালানো মায়ের। এখানকার সবাই জেনে গ্যাছে তার দুরাশার খবর। তাই টিটকিরি। আরও কতো কি। হজম না করে উপায় নেই। 'দাদা তাল গাছ বোনে নাতী ফল খায়' গ্রামীণ প্রবাদের মতো মায়ের সুকর্ম কুকর্মের ভাগীদার তার কন্যা সন্তান, এই তিক্ত বাস্তব মেনে নিয়েই রোজ ঘাটে আসা।

এখন চারদিকের জমকালো অন্ধকার দেখে ভয় পেলো। হারিকেনের আলো সম্বল দোকানগুলোতে এবার ঝাপ পড়বে। আকাশ থেকে, খাল থেকে, ফাঁকা জমিন থেকে, উঠে আসবে চাক চাক আঁধার। সেই সঙ্গে বুঝি জ্বলে উঠবে চান্দুর কতুকুতে দু'চেখের তারা। হাতে পায়ে ও যদিও দোকান বন্ধের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু চেখের দৃষ্টি পাহারা দিচ্ছে নিঃসঙ্গ অসহায় সারাকে। বয়সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে সেটা যতো টেরপায়, ততো বুকের মধ্যে কাঁপন ধরে। এই জমকালো অন্ধকারে বাঁশঝোপের তলা দিয়ে গ্যালে নির্ঘাত 'কন্ধকাটা 'সক্সোর' পাল্লায় পড়বে। ভুতটা নাকি কচি কুমারী মেয়েদের রক্ত জববর পছন্দ করে।

এদিকে হাটতলা একেবারে নীরব হয়ে আসছে। চিন্তাই করা যায় না হপ্তায় একটা দিন এই জায়গাটা কেমন গমগম করে বিকিকিনির গরমে। বাকি ছদিন লঞ্চের সকাল সন্ধ্যার যাওয়া আসায়। এখন প্রেতপুরী। জীবন্ত প্রেত চান্দু এবার কি তার দিকে এগুবে?

কেডা? এমুন গহীন সাঁজে ঐখানে কেউগারে খাড়ায়া?

মান্নান চাচার গলানা? দোকানের হারিকেনের আলোয় বোঝা গ্যালো পুবহাটির মান্নান চাচাই। রাজানগরের হাট থেকে ফিরছেন। গর্দানে নুন, গুড়ের ধামা। হাতে কেরোসিন তেলের বোতল। কাছে এসে একটু ধমকালেও, দুঃখটা বুঝলেন। কোমল বাবহারে তা বুঝতে অসুবিধা হলোনা সারার। তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বল্লো, আপনে এই সময় না আইলে আইজ দাঁত কপাটি লাইগা আমি ঠাইট মইরা যাইতাম গো চাচা।

মরণ কি অতো সোজারে মাও। এই ষাইট বছরের বেমারী বুড়া আমি অখনো হাট কইরা খাই। ঐদিকে শুনি আমার পোলা দুইটা বলে শহর গঞ্জে ভালা ব্যবসায়, ভালা রোজগার করতাছে। এদিইকে বুড়া বুড়ী আমরা খাইটা মরি।

যাননা ক্যান শহরে। ঘেটি ধরেন না ক্যান বেআক্কল পোলাগোরে।

লাভ কিছু নাই। দেখছি চ্যাপ্টা কইরা। তারা কয় তাগোই বলে চলে না। আমাগো দেখবো কেমুন কইরা। যাউগগা আমরাও বাপমাওর দাবি ছাইড়া দিছি। যা পারি নিজেরাই কইরা খাই। অরা তাও সুখে থাকুক।

বৈরাগীর ভিটা থেকে দু'জনের পথ দুদিকে। সারার আর ডর নেই। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মোল্লা বাড়ির লণ্ঠন। বাড়ির কাছাকাছি দয়াল ফকিরের মাজারের আলো। আঙ্গিনার সীমায় ঢোকার আগে একবার মাজারের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। দোয়া চায়। একই দোয়া। মা যেনো ফিরে এসে তাদের নিয়ে যায় তার কাছে

এমন সময় বাবা সাধারণত ঘরে থাকে না। তাস পিটে এশার নামাজের পর ফেরে। তোলা পানিতে পা ধুয়ে উঠে বসে খেজুর পাতার চাটাইতে। এ ঘরে কেরোসিন আসে না বহুদিন। খুব দরকার হলে জ্বলে রেলির তেলের মিটমিটে পিদিম। বাবা আজ মাজারের মোম থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে চালায় ঢুকে, বিড়ির আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি দ্যাখে কে জানে। তবে হাকটা দেয় বাজখাই গলায়, ঐ সারা, সানা, সবুরা, সোনা ঠিক ঠিক আছতো সব কয়টা।

না থাইকা উপায় কি যমে কি দ্যাখে আমগোরে।

একদিন খিদের কামড় সইতে না পেরে কথাটা বলে ভীষণ মার খেয়েছিল আট বছরের সবুরা। সেই থেকে সব চুপ করে থাকে। ঘুম না এলেও ভান করে ঘুমের।

আজ বাবা ফিরলো ফর্সা সার্ট প্যান্ট পরা একটি লোক সঙ্গে করে। হাতে জ্বলন্ত দেশলাই এর কাঠি। দাওয়ায় উঠেই হাক দিলো, কৈরে ?

কথাটা কানে গ্যালো তিন বোনেরই। তিনজনই ঠেলতে লাগলো প্রত্যেককে। বাবা যতোক্ষণ সবুরার চুলের ঝুঁটি ধরে না তুললো ততোক্ষণ কেউ উঠলো না। পল্টু মৃধা বল্লো, সবুরা তুই পিদিম জ্বালা। সাবা মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে ব্যাপারী সাবরে খাইবার দে। আর সারা আয় পিদিমের সামনে।

সারা যখন প্রদীপের কাছে এলো তখন বাবা সেই লোকটাকে প্রশ্ন করছে, তো মিয়াসাব পায়েল অপেরায় আপনের কি কাম ?

লোকটা বল্লো, সাজ, সাজের কাম।

তার মাইনে আটিস। নট নটীগো সাজান গোজান। না নিজেই সাজেন রাজা বাদশা, উজির নাজির।

আপনে মিয়া জব্বর বেশি কথা কন। ঐ হগল ছাইড়া আসল কারবারে আসেন। মাইয়ারে কন বইতে। অ-পল্টু মিয়া-

খাড়ান খাড়ান। আগে একখান ভুল ভাঙ্গাই। পলটনে আছিলাম বইলা মাইনষে কয় পল্টু, নাইলে আমার আকিকার নাম রহমত আলী মৃধা।

ঐ হইলো। রহম বেরহম যাই হন কনু কামের কথা। আলতু ফালতু সমায় যাত্রার মাইনেষেগো হাতে থাকে না।

আমারেও হেজি পেজি লোক ভাইবেন না। আইজ অবস্থা পইড়া গ্যাছে, নাইলে তো আছিলাম জাইত সাপের বাচ্চাই-নামডাকওয়ালা মৃধা খান্দানের আওলাদ।

গসিপউসিব ফালায়া থোন। অখন তফাতে আসেন। মাইয়ারে যা দেখনের দেখছি। পাকা কথা হইয়া যাউক।

হোউক।

পল্টু মৃধা অচেনা লোকটির সঙ্গে সুপারী বাগানের ফিকে অন্ধকারের দিকে চলে যেতে সানা ফিসফিস করে বল্লো, রকম সকম জুইতের লাগতাছেনারে বুজি। যে মানুষটা আইলো তারেও সুবিধার ঠেকলো না।

সারা বল্লো, তর তো খালি সন্দ আর সন্দ। প্যাটে অতো জিলাপীর প্যাচ রাখলে খালি দুঃখখু বাড়ে কইছে মরব্বাক চাচায়। নে ঘুমা।

সারার চোখ বুজে আসছিলো,হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকলো পল্টু মৃধা। হাক ডাকে উঠে বসালো সবাইকে। বাবার হাতে মিস্টির হাড়ি। পিদিমের এক চিম্‌টি আলোয় জ্বলজ্বল করছে ইয়া বড়ো বড়ো লালমোহন। একসঙ্গে পাঁচটি প্রাণী ঘুমড়ি খেয়ে পড়লো।

এক সময় পল্টু মৃধা সবাইকে ডানার ঝাপটায় সরিয়ে দিলো। রাতেই সব সাবড়ে দিলে সকালে খাবে কি ! সিকায় হাড়িটা তুলে রেখে শোবার আগে বল্লো, সারা তর লাগি একখান পদ্ম সাবান কাইল বাজার থন আইনা দিমু। ভালা কইরা গুসল করবি। তরে যাত্রা দেখাইতে লইয়া যামু কাইল রাইতে।

সানা বল্লো, আমগো নিবানা বাবা ?

না দুইখান টিকিট পাশে পাইছি।

আমগো না নিলে আমরা কান্দুম।

কান্দ। কান্দনের কপাল লইয়াই তো আয়ছত তরা।

শেষের শব্দ গুলো ধমকে ভয়ংকর। কথা সরে না আর কারুর মুখ থেকে। বলতে গ্যানে ভয়েই ঘুমিয়ে যায় চার ভাইবোন।

বাজার বেলায় সত্যি সত্যি আসে সুগন্ধী তেল, সাবান। নতুন সালোয়ার কামিজ। রাতে সেগুলো পরে বিষণ্ণ ভাইবোনদের পেছনে রেখে সারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো বাবার পিছু পিছু।

পায়েল অপেরায় সন্ধ্যা থেকে দর্শক টানার জন্য মাইকে বাজে হিন্দি বাংলা জনপ্রিয় রেকর্ডের গান। এখন বাজছে যাত্রাদলের নিজস্ব বাজনা। তাঁবুর তলাটা আলোয় ঝলমলে। চেয়ারে চেয়ারে বসে আছে ঝকঝকে পোশাক পরা সাহেবরা। কম দামের সীটে পরিব দর্শক। আরো পরিবরা ঠাণ্ডা মাটির খলপাতে বসে।

বাপ বেটিকে নিয়ে যাওয়া হলো সাজ ঘরে। সেই লোকটা, কাল সন্ধ্যার আগন্তুক আজ পরে আছে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি। সাজার কাজ বলেছিলো; পল্টু মৃধা ভেবেছিলো পার্ট টার্ট কিছু করে। দেখলো লোকটার কাজ হচ্ছে কর্তাব্যক্তিদের জন্য তামাক সাজা। তবে ওপরওয়ালাদের ওপর প্রভাব কিছু আছে বোঝা গ্যালো। সাদা ধবধবে লুঙ্গি, কল্পিদার পাঞ্জাবি গায়ে দশাসই একজন মনিবের কানে কানে কিছু বলতে সে ঘাড় দোলালো সামান্য। কাছে ডেকে বসালো পল্টু মৃধাকে। বল্লো,এই তোমার মেয়ে সাবারণ।

একটা টিনের বাক্সের ওপর বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে এলো সারার। কানে আসছে দ্রুত লয়ের ঘুংগুরের শব্দ। হারমোনিয়াম তবলার সঙ্গে প্রায় বেসুরা গলার মেয়েলী আওয়াজ। গানটা খুবই পরিচিত- অ অচিন নাগরের.....।

তাদের ঘরে রেডিও নেই। কিন্তু প্রতিবেশীদের আছে। প্রায়ই শোনে। গাইতেও পারে শুনে শুনে। এমন গান, এমন নাচ রেখে ওকে এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে বেরসিকের মতো এখানে ? বাবার কি গুন গুন করে কথা বলা শেষ হবে না তামাম রাতে ? কি অতো কথা অচেনা লোকটার সঙ্গে।

সার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে এক সময় কাছে এসে বসলো বাবা। বাবাকে কাঁদতে কখনো দেখেনি সারা। অবাক হলো। সেটা আরও বাড়লো যখন শুনলো এই যাত্রাদল আগামী কাল ঢাকা যাচ্ছে। সেও যাবে তাদের সঙ্গে। ওরা ওকে নাকি পৌঁছে দেবে মায়ের কাছে।

সারা কি স্বপ্ন দেখছে ? যে মায়ের জন্য তিন বছর ঝড় নেই, রোদ নেই সে দাঁড়িয়ে থাকে হাট তলার লঞ্চঘাটায়, সেই মা সত্যি তাকে ডাকছে।

মনটা পর মুহূর্তে ছোটো হয়ে গ্যালো। সে না হয় অভাবী সংসার আর বাবার অমানবিক ব্যবহার থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু ওরা ? বাবার মন মেজাজ ভালো থাকলে যাদের ডাকে, সানারন, সবুরন বলে। আজ সকালেও সবুরার পিঠের চামড়া উঠে গ্যাছে বাবার ধারালো নখের আচড়ে। অপরাধের মধ্যে একটা বেশি লাল মোহন চেয়েছিলো।

ঘাড় বাঁকা করে সে বল্লো, না বাবা মায়ের কাছে আমি একলা যামুনা। সানা সবুরারেও লগে লইয়া যামু।

দপ করে জ্বলে উঠলো পল্টু মৃধার লালচে চোখ জোড়া। এই চোখেই পানি ঝরছিলো বিশ্বাস হয়না। থাবা মেলে মেয়ের ঘাড় ধরতে দেরী হতোনা. পুরো ব্যাপার সামাল দিলো মনিব চেহারার সেই মানুষটি। খুব ঠাণ্ডা গলায় সে বল্লো, ও মেয়ে তুমি ভাইবোনা। অখন তোমার মাও তোমারেই লয়া যাইবার কইছে।

পরে পরে অন্তে অন্তে অরা, তোমার বুইনেরাও যাইবো। এক লগে এতো গুলান মানুষ গ্যালে তোমার মাও মুস্কিলে পড়বোনা ?

কথাটা যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছে সারার। মা নাকি শহরে আয়ার চাকরি করে। একসঙ্গে বাড়তি তিনটি মুখ খাওয়ানো মুখের কথা নয়, অভাবের সংসারে থেকে সে তা বুঝেছে।

কখন সকাল হবে, লঞ্চে উঠবে ? কি নাম হবে লঞ্চটার ? বাদল এক্সপ্রেস. এম এল অভিযান ? এম, এল, ইছামতি ? নাকি স্টিলবডি সেই দৈত্য জাহাজটা ? ওটা কাঠের নয়, ইস্পাতের তৈরি। সূর্যের আলোয় রাজকীয়ভাবে চলে। চোখ রাখা যায় না এতো ঝলমল করে তখন। ঝড় বাদলে অন্য লঞ্চগুলো যখন ঘাট ছাড়তে ভয় পায়, ওটা তখন দাপটের সঙ্গে ঘাট ছাড়ে। হে খোদা, হে বাড়ির ধারের মাজারের দয়াল ফকির একবারের জন্য হলেও আমার একটা খায়েশ পূর্ণ করো। ঐ জাহাজটাই যেন সকালে আসে, আসে।

ঘুমিয়ে যায়।

যখন জাগে প্রথমটা বুঝতে পারে না কোথায় ? নৌকার মতো দুলুনী। নৌকার মতো খোল। একটা লণ্ঠন ঝুলছে সামনের দিকে। বেশ বড়ো নৌকা। তার এপাশে ওপাশে ঘুমাচ্ছে আরো কিশোরী যুবতীরা এরই ভেতর কে একটা মেয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। চাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি জানালো, চাচা ওকে বিক্রি করে দিয়েছে অপেরার মালিকের কাছে। এখন থেকে ওকে তালিম নিতে হবে নাচ গানের। নাচতে হবে মূল যাত্রা শুরু হবার আগে ভাগে। ঐসব প্রলয় নাচ উঠতি বয়সের মেয়েদের শরীর ছাড়া নাকি সহজে জমে না। তাই এই কিশোরীদের কেনা হয় চড়া দামে।

শুনতে শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসে সারার। অথৈ পানিতে ডোবা মানুষের মতো তাকায় চারদিকে। তবে কি বাবা সত্য কথা বলেনি ? সেই মেয়েটাও যে ঘুমিয়ে গ্যাছে কাঁদতে কাঁদতে। কাকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করবে ?

গল্পের গল্প

হোটেল সি ভিউতে যখন পৌছলাম, সন্ধ্যা তখন পার হয়ে গ্যাছে। সমুদ্রের এতো কাছে এসেও সমুদ্র না দেখতে পাওয়ার খুতখুতি চৈতন্যে টের পাচ্ছি।

এটা আন্তর্জাতিক পান্থনিবাস। সামনে রঙিন তাঁবু স্টাইলের কটেজগুলো ঢুকতেই চোখ টানে। দারুণ গ্রীষ্মে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জেনে আরও। সবুজ লন, দেশী বিদেশী ফুলের কাছাকাছি থাকা। তবু কটেজ পরিত্যক্ত হলো। ওখান থেকে আর যাই হোক সমুদ্র দেখা যায় না।

প্রধান দালানের দোতালা থেকেও নয়। সুতরাং ঘর নিতে হলো তেতলায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাঝারি রুম। আধুনিক সব ব্যবস্থার মধ্যে ভিসিআর রয়েছে। হোটেলের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে দু'বেলা দুটি ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। এখনো চলছে হাম্বারাম্বা মার্কা বোম্বাই ফিল্ম। সুইচ অফ করে জানালার ধারের চেয়ারে এলাম। শুক্লপক্ষের চাঁদ রয়েছে কোথাও। নিচের কটেজগুলোকে দেখাচ্ছে স্বপ্নপুরীর মতো। পেছনে ঝাউ বন। বন ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ বালুবেলা। বিশাল বিশাল সফেন ঠেউ নিয়ে নিসর্গের সীমাহীন নির্জনতায় গরজাচ্ছে পিঙ্গল সিন্ধু। মোছা মোছা চাদনীতে কখনো ঝিলিক দেয় দড়িপাকানো ঊর্মিমালা। কখনো নিপাট রূপালী চাদরের মতো দূর অর্ণব। যখনই জাগো তখনি সমুদ্রের শব্দ। গতানুগতিক রাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক রাত্রি।

সূর্যোদয়, সাগর পাখি, জেলে ডিঙ্গি, প্রভাতিক জীবন্ত ফ্রেমে বাধানো ছবিটা পাঁচতলার ছাদ থেকে দেখে নিচে নেমে এলাম। মালিরা, বয়রা ব্যস্ত সকালের কাজে। দক্ষিণের দরোজা পেরিয়ে সদর রাস্তা। ফাঁকা ফাঁকা। দূরে দূরে কিছু ভবন। গঠন থেকে বোঝা যায় এই শতাব্দীর শুরুর দিকের বিত্তশালী জমিদারদের তীর্থ ভ্রমণ, ছুটি কাটাবার আস্তানা। একদার জালিদার বারান্দা, কুমড়ো ফালির মতো রোয়াক জাঁকজমক জৌলুশে সোরগরম ছিলো।

এখন কোনটার ভগ্নদশা। কোনটা টিকে আছে জোড়া তালি দিয়ে। সামনে ঝাউ বন। ডালে ডালে অচিন পাখির কিচির মিচির। কাজুবাদামের বাগান। সুন্দর নোনা-সোঁদা ঘ্রাণ ভোরের বাতাসে। পরের ছড়ানো ভূমি বালির অজস্র খেলনা পাহাড়ে উঁচুনীচু। ওরই মাঝে পায়ে চলার মতো একটা পথ আপনা থেকে

হয়ে আছে।

সকালের সমুদ্র ঠাণ্ডা সতেজ পবিত্র। পাড় ধরে হাঁটাহাঁটি করছে প্রাতঃবায়ুসেবী কিছু প্রৌঢ়। কোনও কোনও জেলে নৌকা চকিতে তীরে ভিড়ে আবার চলে যাচ্ছে পাল তুলে।

মুড়ির ঠোঙ্গার মতো টুপি মাথায় নুনিয়ারা। কালো চিকন শক্ত শরীর। স্নানার্থীরি সমাগম না হলে ওরা বেকার। ভেজা বালিতে জাপ্টে বসে কথা বলছে। টুকরোগুলো জোড়া দিলে এমনি দাঁড়ায়—

মেয়েটা কুম্ভীপাকের চক্করে পড়েছিলো।

না না চোরা স্রোতে।

আরে নাঃ কারদানী করে ব্রেকিং পয়েন্টের ঢেউ—এ লাফাতে গিয়েই যতো কেলেংকারী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো? বলেছি না এটা শ্রীক্ষেত্র। মহাপ্রলয়ের প্লাবনের সময়ও এ জায়গা ছিলো জলের ওপর। সপ্তকল্পজীবী মার্কেণ্ডেয় মহর্ষি এই শঙ্খ ক্ষেত্রের বটতলায় বসে তখন বিষ্ণুর দর্শনলাভ করেছিলেন। তাইতো কাণ্ড হতে হতে—

মাইরী ভাই মেয়েটা দারুণ সুলক্ষণা।

সুদর্শনাও। কি হাত কি পা। নাক মুখের কাট কাট গড়ন। যেনো কোর্ণাকের সূর্য মন্দিরের পাথুরে মূর্তির একটি নেমে এসেছিলো জ্যান্ত মহিমায়।

বাউরে ছেলেটাও কম যায় না। রোগাভোগা দেখালে কি হবে। শরীরে বেজায় শক্তি.....এই যে বাবু, দিদিমনি ..... পাঁচ বছর একনাগারে এ লাইনে রয়েছি ..... দেখুন হাত নয় লোহার কব্জি, কখনো কোনও .....এই যে মা জননী .....

প্রভাতী ধানী রং রোদে লোকজন জমা হচ্ছিলো এদিক ওদিক থেকে। এতোক্ষণের সখ্যতা ভেঙ্গে নুনিয়ারা পরস্পর প্রতিপক্ষ এখন। একটু বয়সীরা সমুদ্রে নামে না। কেউ দাঁড়িয়ে থাকে দর্শকের ভূমিকায়। কেউ পড়ে নুনিয়াদের খপ্পরে। ওরা প্রস্তাব দেয় তীরে ছাউনি তৈরির। দশ পনোরো রূপীর ভেতর দর ওঠানামা করে। খদ্দের জুটলে কোত্থেকে হাজির হয় চারটা কঞ্চি বাঁশ। ফুদে হোগলার চাল। বসার জায়গা নরোম বালি। একটু যারা বিত্তবান বা আয়েসী, তাদের জন্য চড়া মূল্যে হাজির হয় সৌখিন রঙিন ইজিচেয়ারে। স্নানে যাবার আগে আরও বিলাসীরা বালক মালিশওয়ালাদের দিয়ে দেহ ম্যাসেজ করায়।

যুবক নুনিয়ারা তাকে তাকে ঘোরে। কোথায় আছে বৃদ্ধ-বালক-বালিকা। সমুদ্র স্নান বুড়োদের জন্য পুণ্যের অংশ, ছোটদের জন্য আনন্দের। কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ভেসে যাবার আশংকায় ডাক পড়ে নুনিয়াদের।

ছোট্ট প্যান্ট, কাঁধে তোয়ালে, সাঁতারের পোশাক পরা স্ত্রী আর বছর সাতের ছেলে নিয়ে এলো এক যুবা। বাচ্চাটাকে নুনিয়ার

হাতে দিয়ে নিজেরা হাত ধরাধরি করে নেমে গ্যালো হাঁটু তরঙ্গে। তাদের পাশে পাশে বকের মতো লম্বা পা পেলে এক তরুণ।

পাড়ে কিছু কিশোরী ঝিনুক শামুক কুড়াচ্ছে। কিছু হাতের শেকলে চক্র করে দাপাদাপি জুড়েছে কম পানিতে। শক্তপোক্ত শরীরের এক মহিলা রিংএর বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের জ্ঞান দিচ্ছে কেমন করে স্রোতের মুখোমুখী হতে হয়। মুখ নয় পিঠের দেয়াল খাড়া করে সামাল দিতে হয় ছুঁটে আসা ফণাতোলা পাগ্‌লা ঢেউকে।

একটু দুরে ছেলেরা ঝাপাঝাপি করছে। বল নিয়ে, গেঞ্জি নিয়ে খেলছে। ছুঁড়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো ভেজা বালি। মেয়েদের দিকে লঘু মন্তব্য।

বক ঠ্যাং ছেলেটির গাট্টা-গোট্টা মা পাড়ে বসে স্বামীকে ভয় গরবী সুরে বলছে, বাপরে কি সাহস ছেলের। কে বলবে ও প্রথম পুরীর সমুদ্রে নেমেছে।

ঝোলা কাঠে কপট চেহারার একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে। সুযোগ পেলেই খাঁটি পাথর বলে ঝুটা মোতির মালা গছিয়ে দিচ্ছে একে-ওকে। বয়সী মহিলা দেখলে সযত্নে বের করছে সাদা, কালো ছোট ছোট মূর্তি—এটি মা জগন্নাথ, এটি লছমি মাই -এর ভব-আদল। আমার নিজের হাতে গড়া।

পাশে বসা তরুনী হেসে ফেললো, তুমি কোথাকার কোন কলেজের পাশ করা শিল্পী এ্যা।

আশেপাশের যুবকরাও হাসলো শব্দ করে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েও সামলে নিলো—এ হচ্ছে ভুবনেশ্বরের মহিমা। বংশ পরম্পরায় আমরা জাতে ভাস্কর। আছে নাকি আপনাদের ভেতর কেউ ছাপমারা কারিগর। ভুল ধরুন দেখি। হয় ভুল ধরুন নয় মূর্তি কিনুন।

মামা বাড়ির অবদার। আমরা মূর্তি কিনে কি করবো? ছাত্র মানুষ।

মা-দিদিমারা তো তা নন। নিয়ে যান আর্শীবাদ পাবেন।

লোকটার কাছে আর কিছু না হোক সেলস্‌ম্যানসীপ শেখা যেতে পারে।

হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে ওরা আবার চলে গ্যালো সাগরে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, রোদ তেজী হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কমা শুরু হলো। সূর্যের তাপে বালু গরম শুধু হয় না, সমুদ্রও রুক্ষ হয়ে যায়। নানা রকমের বৈরী স্রোত বইতে থাকে পাড়ের কাছাকাছি ব্রেকারগুলো ঘিরে। খুব উৎসাহী তরুণরা ছাড়া সাধারণত অন্যরা থাকে না তখন।

এই অবসরে কয়েকদিনে আগে ঘটে যাওয়া সুদর্শনার গল্প নিয়ে পড়লো নুলিয়ারা —এমনি সময় সেই মেয়েটিও ফিরে যেতে

রাজী হলোনা ওর পরিবারের সঙ্গে। নাম ছিলো চম্পা। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলো।

সঙ্গে তখন বড় ভাই বৌদি ছিলো। ওদের সামনের ঢেউ এ খেলছিলো কয়েকজন যুবক। বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। চম্পার দিকে কখনো গেলে সে লুফে নিচ্ছিলো। ফেরত পাঠাচ্ছিল। এর মধ্যে ফ্রিজবী হাতে নামলো এক ছোকরা। বল বাদ হয়ে শুরু হলো ঐ খেলের কারদানী।

বাহাদুর বটে। ফ্রিবীর চক্রটাকে জ্যান্ত ব্যাঙের মতো পানিতে হটাচ্ছিলো যেনো ছোকরা। কিন্তু আসা থেকেই ওর চোখ যে কোথায় ছিলো সবাই খেয়াল করে হাসাহাসি করছিলো।

ভাগ্যিস খেয়াল করেছিলো। নইলে কি যে কপালে ছিল মেয়ে দুটির।

চম্পা আর ও বৌদি।

বৌদি খেলতে খেলতে চুপিসারে ছেলেটির নাম দিয়েছিলো চান্স মোহাম্মদ। চান্স রোমিও।

যাই বলিস খেলা জমেছিলো দারুণ। ওরা দুজন, কোত্থেকে এসে যোগ দিয়েছিলো আর একটি মাদ্রাজী তরুণী।

এই জমটি খেলার ভেতরই ঘটে গ্যালো সর্বনাশা ঘটনাটা। ভাইরে ভাই আমরা তো বলতে গ্যালে সাগরের পোকা। ব্যাপার দেখে আমারও দুটি পা একেবারে বালি গাথা হয়ে গ্যালো। ঐ ঢেউএ একবার গিয়ে পড়লে সমুদ্র দেবতা তাকে ক্ষমা করে না। চোখের পলকে প্রাণ ভক্ষণ করে ছিবড়ে দেহটা ফিরিয়ে দেয় সৈকতের দিকে।

চম্পা কিন্তু একবাও চেচায়নি।

বেল্লিক একটা। চেঁচাবে কেমন করে। চোরা স্রোতের কিলবিলে ডানাগুলো যখন জড়িয়ে ধরে, জলেডোবা মানুষ তখন কি শব্দ করতে পারে?

ওর বৌদি প্রথম চেঁচিয়েছিলো নুনিয়া নুনিয়া করে।

না না হেল্প হেল্প বলেছিলো।

সে ঐ মাদ্রাজী মেয়েটা। আসলে ওরা কেউ সাঁতার জানে না এগুবে কেমন করে। সঙ্গের যুবকটিও না। সেও চিৎকার করছিলো।

যাই বলিস ফ্রিজবীর ছেলেগুলো ভীষণ বেপরোয়া। বিশেষ করে ঐ চান্স রোমিও। সবার আগে সেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। প্রাণ থাকে কি যায়।

ঠিক বড়ো পর্দার ছবিতে যেমন দেখা যায়। মাইরী তার চেয়েও কঠিন নাটক। মেয়েটাকে স্রোতের ছোবল থেকে উদ্ধার করে, ঘাড়ে বয়ে নিয়ে আসার সময় চান্স রোমিওর সেকি বিলাপ।

বিলাপ ক্যানো?

হবে না! সে বারবার বলছিলো ঐ সময় তার অন্তরাত্মা নাকি ভর করেছিলো ইভিল পাওয়ারে। সে চাইছিলো অমন কিছু ঘটুক

যার সূত্র ধরে চম্পার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কিন্তু মেয়েটা যে আধমরা হয়ে যাবে এমন তো চায়নি। তাই বিলাপ.....

নুলিয়ারা চলে যাবার পরও আমি বসেছিলাম পরিত্যক্ত এক ছাউনীর ছায়ায়। স্নানার্থী ছিলো না। দর্শকও নয়। দুরে দুরে ঝিনুক কুড়ানো মেয়েরা। মিসমিসে কালো, রোদে পোড়া শরীর। ঘাগরা কাঁচুলী পরা কিশোরীর দল। ওদের মাথায় ওপর চক্কর দিয়ে ফিরছে কাকেরা। ঢেউ এর ধাককায় পাড়ের বালিতে প্রায় ছিটকে আসে তারা মাছেরা, জেলী ফিসেরা। বায়সকুল শূন্য থেকে তাকে তাকে রয়েছে প্রিয় খাদ্যের।

মরু-উত্তপ্ত বালু ভেঙ্গে দুপুরে হোটেলে ফিরলাম। নুলিয়াদের কথা থেকে জানা হয়েছিলো চম্পা নামের ডুবন্ত মেয়েটি চান্স রোমিওর কাঁধে চড়ে পাড়ে পৌঁছে কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। সঙ্গের যুবক-যুবতীর ডানায় ভর করে সে ফিরে যেতে পেরেছিলো হোটেলে। পরের ঘটনা জানার জন্য বিকেলে আবার এলাম। নাঃ এবেলো ওরা কেউ নেই। ঠিক নেই নয়, আছে ছুটকো-ছাটকা দু' একজন। বাদাম ভাজা মুড়ি ভাজা নিয়ে বালকরা ছুটোছুটি করছে। বালিকাদের হাতে হাতে ঘুরছে ধবধবে শঙখের মালা, বালা। ওদের ভেতরও দেখলাম সেই একই প্রসঙ্গ। কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে মনে হলো। কিন্তু শেষটা কেউ বলতে পারলো না। বল্লো হোটেলের একটা বেয়ারা- সিনেমার চেয়েও কড়ামাত্রার কাহিনী। জগন্নাথের মন্দিরে দেখা গেছিলো ওদের দু'জনকে।

অন্যজন বল্লো, মন্দিরে ক্যানো হবে কোর্টে। মেয়েটা মুসলমান, ছেলেটা হিন্দু।

একেই বলে মহামিলন। এমন হতে হতে একদিন এই পৃথিবী থেকে জাত-পাত একাকার হয়ে যাবে।

আরে দুর এগুলো একদম গসিপ্। ওরা যে যার জায়গায় ফিরে গেছে।

তুমি জানো কচু। সমুদ্রের ও ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। পরেরটা চোখে দেখিনি। কিন্তু গুরুজনেরা বলেন কিছু একটা ঘটে আর একটা কিছু ঘটার জন্য। সে হিসেবে গ্যালে প্রথমটার মতো পরেরটাও খাঁটি।

কেমন নেশায় ধরে গেলো। ঘটনা বৈচিত্র্যের দাবিদার তেমন নয়। কতোই ঘটছে এমন গল্পে, সিনেমায় বহুল ব্যবহৃত বিষয়ে। তবু তাজা ঘটনার আলাদা একটা আবেদন আছে। তারই টানে রওনা হলাম পুরী হোটেলে। বাহক সাইকেল রিকসা। রাতও নটার দিকে। রাস্তাঘাট একটু নির্জন হলেও নিরাপদ।

পুরী হোটেলের ধার রীতিমতো গমগমা। সমুদ্রের গা ঘেঁষে বিস্তর দোকান পসারী। উজ্জ্বল আলোয় ভাসা চারদিক। কেনাকাটা

চলছে। একদিকে গান বাজনা। ম্যাজিকের ছোট্ট একটা তাঁবু। সিজনে পুরো সৈকত ভরে নাকি জমজমাট থাকে সার্কাসে, উটদৌড়ে, চড়ক ও যাবতীয় মেলার সরঞ্জামে।

চাম্প রোমিওর রুমের নাম্বার সংগ্রহ করেছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গ্যালো আজ সকালের ট্রেনেই সে ফিরে গ্যাছে।

প্রশ্ন করলাম, একা?

একাই তো।

কথাটা বলেই ম্যানেজার যেনো কিছুর সূত্র পেলেন। বল্লেন, সেই ঘটনার খোঁজে এসেছেন?

ঠিক খোঁজ নয় কৌতূহল।

আপনি নিশ্চয় সি ভিউতে উঠেছেন।

উম্। ওখান থেকে আরও কেউ এসেছিলো?

কদিন ধরে গোনাগুন্তি জনা কয়েক। ঘটনাস্থল ওটাই কিনা। তো আপনি কি জানতে চান? বিয়ের ব্যাপারটা?

ওরা তেমনি বলাবলি করছিলো।

নুন্সিয়াগুলোর দিনেমানে কাজ তো ঐ একটাই। যাত্রী ধরা। আর গালভরে গসিপ্ করা। বিয়েফিয়ে আবার কি।

তার মানে?

মেয়েটি বিবাহিত ছিলো। বিবাহিত মেয়ের আবার বিয়ে কি? আর ঐ যে সঙ্গের যুবকটি ওরা যাকে ভাই বানাচ্ছে, আসলে সেই তো স্বামী। আর মহিলাটি স্বামীর বোন। বৌদি নয়। সেদিন রাফ সীতে যা ঘটেছিলো সত্য সেটুকুই শুধু।

ম্যানেজার একটু থেমে কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার বল্লেন, আপনি যে হোটেলে উঠেছেন ওখানে আঙুলে গোনা মানুষ। আমাদের এখানে আসুন। একদিনে দেখবেন কতো জ্যান্ত গল্পের দেখা পেয়ে যাবেন।

এখনো

সুন্দর ছবিকেও হার মানায় এমন একটা দৃশ্য চোখের সামনে। দুর পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগুচ্ছে কাঠমুণ্ডু-পোখারা ফ্লাইট।

সকালের কাঁচা রোদে একটু আগেও ঝক ঝক করছিলো সবুজ পাহাড়, ধবল জলপ্রপাত, নীল উপত্যকা। হিমালয়দুহিতা অন্নপূর্ণার চির তুষারে ঢাকা শৃঙ্গে সপ্তরং লুকোচুরি খেলতে খেলতে তৈরী করছিলো বহুবর্ণের দৃষ্টিধন্য চালচিত্র।

হঠাৎ অদৃশ্য খেয়ালী হাতীর শুঁড় থেকে যেনো ছাড়তে লাগলো গুড়োগুড়ো জলধারা। পাতলা স্তরের কুয়াশা আবরণে দুভাগ হয়ে গ্যালো জমিন অসমান। আর প্লেনটা যেনো ময়দানবের হাতের আলতো গোত্তা খেয়ে পড়িমরি করে নাক ঘুরিয়ে ছুট দিলো উল্টো দিকে।

হায় হায় রব উঠলো পোখারা এয়ারস্ট্রিপের যাত্রীদের মুখে। আজ নিয়ে টানা তিন দিন এমনি চল্‌ছে। ভোরের আকাশ আলোয় হাসে। কাঠমুণ্ডু ত্রিভুবন বিমান বন্দর থেকে উড়ো জাহাজ ওঠার খবর আসে। শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নামতে পারে না। ফিরে যায় প্রাণটি হাতে করে।

যাত্রীদের আধাআধি সাদা চামড়া। বাকিরা কালো, তামাটে নানা বর্ণ এবং জাতের। স্থানীয়জন একেবারে হাতেগোনা। এয়ারক্রাফট দুচার দিন নামতে না পারলেও মাথা গোজার সমস্যা তাদের ছুতে পারে না। কিন্তু সীমিত অর্থ বা সময় নিয়ে কারবার যাদের, তাদের গলা থেকে বেরোয় আধফোটা আর্তনাদ। বাকি যে দলটা, টাকা,সময়,সমস্যা নয় যাদের, তারা পড়ে দারুণ বিপাকে। ঠাঁই সংগ্রহের বিপদ।

টুরিস্ট গাইডের বক্তব্য অনুযায়ী এশিয়ার প্রথম মর্ত স্বর্গভূমি কাশ্মীর। দ্বিতীয় পোখারা। এই বেহেস্ত দর্শন এবং বাসের জন্য সিজনে ছুটে আসে দেশ বিদেশের অগুন্তি ভ্রমণবিলাসী। পাঁচ তারা থেকে এক তারা কিংবা তারকাবিহীন অনুজ্জ্বল হোটেল থাকে ভরভরন্ত।

এর ভেতর যদি ক'দিনের জমানো যাত্রীদের ফিরে যেতে হয়, আক্ষরিক অর্থেও যেগুলো পান্থনিবাস তাতেও আশ্রয় মেলা মুস্‌কিল। কাঠমুণ্ডর বাস আছে। আছে ছঘন্টার ক্লান্তিকর পাহাড়ী

পথভাঙ্গা। উপায় না দেখে কেউ কেউ সেসব দিকেই সটকে যায়।

আমরা যখন পৌঁছেছিলাম কাদায় পানিতে ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপের অতিথি ঘরটি প্যাচপ্যাচে। কাঠের সিঁড়িতে পা রাখতেই দৈত্যের মতো লম্বা জার্মান যুবকটি ঠোঁট উল্টে বল্লো, আজো আশা নেই।

কেউ কারু পরিচয় না জানলেও দুদিনে মুখ চেনা হয়ে গ্যাছে। ঘুরেফিরে সেই তো আমরাই। পাশ থেকে মধ্যবয়সী এক আফ্রিকান বল্লো, আগামীকালের আশ্বাসও এরা দিতে পারছেনা।

আচ্ছা মুসিবতে পড়া গ্যালো।

প্রকৃতির কাছে মানুষ তো চিরকাল পরাজিত। এরা কি করবে।

তা ঠিক কিন্তু আমি পড়লাম মহাসাগরে। আমার পরিবার আতংকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।।

সঙ্গে ওষুধপত্র কিছু আনেননি?

না। কি করে জানবো ভূস্বর্গে ভালো ডাক্তার বা ওষুধপত্র মিলবেনা।

সে কি মশাই ট্যুরিস্ট গাইডে তো স্পষ্টাস্পষ্টি লেখা রয়েছে প্রয়োজনীয় দাওয়াই টাওয়াই সঙ্গে আনবেন। এখানে ওসব সুলভ নয়।

দলের মধ্যে কারা কথা বলছে জানার, দেখার আগ্রহটুকুও নেই। মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ঘাড়গোজার জ্যান্ত সমস্যা।

তার চেয়েও বড়ো ধকল ট্যাক্সি পাওয়া। শহরের সবগুলো গাড়ী ইমপোর্টেট। কিন্তু সংখ্যায় এতো কম, একটার জন্য বৃষ্টি মাথায় একসঙ্গে ছুটে যায় দশজন। কপাল ভালো এইমাত্র যেটা এসে দাঁড়ালো, চেনা ড্রাইভার। গত কয়েকদিন দর্শনীয় জায়গাগুলোতে ওর গাড়ীতেই আমরা ঘুরেছি, সৈয়া বাহাদুর কর্মচারী জানলায় মুখ বাড়িয়ে বল্লো, বাদলায় জাহাজ নামতে পারেনি তো। উঠে আসুন।

মাঝারি বর্ষণে ততোক্ষণে আকাশ মাটি এক হয়ে গ্যাছে। দিক হারানো পাহাড়ী দেয়ালে তৈরী একটা মধ্যবৃত্তে যেনো ছুটছে গাড়ী। কিন্তু বেরুতে আর পারছে না। গোলকধাঁধা আর গোলকধাঁধা। মানে জায়গার জন্য যেখানেই যাওয়া সব খানেই যেনো নাই নাই শব্দটা ভয়াবহভাবে টেপ হয়ে আছে। অচেনা বিভূঁইয়ের ম্যাটম্যাটে দিনের আলোয় রীতিমতো আতংক ঢুকে গ্যালো—তবে কি অনাহূতজনের মতো পথে পথে ঘুরতে হবে?

ক্লান্ত গলায় বল্লাম, কি করা যায় বলো তো সৈয়া বাহাদুর।

রাস্তা কিছু বাতলাতে পারি। কিন্তু আপনাদের কি পছন্দ হবে?

মাথার উপর ছাদ আছে তো?

টুটাফাটা সামান্য থাকলেও থাকতে পারে। তবে আছে। ঠাঁই যেমনই হোক খাতির যত্নের ত্রুটি পাবেন না। একেবারে পেরস্থী ঘরের আরাম।

বেশ সেখানেই চলো। একদিনেরই তো ব্যাপার।

আমার কথার শেষে নাক ঘুড়লো স্টারলেটের। দক্ষিণে ঢেউ খেলানো কালো পাহাড়। খাজকাটা টেরাসী। ক্যাকটাসের জংগল। কালো ময়ালের মেলে রাখা বিশাল শরীরের মতো মসৃণ রাস্তা। সামান্য চড়াই উৎরাই করে শহরের একমাত্র চৌমাথা। মাঝের আইল্যান্ডে একফোটা গাঢ় জর্দারং অনর্গল নড়াচড়ায় ব্যস্ত। দূর থেকে মনে হয় কমলা রেন কোট পরা দম দেওয়া একটা কালো পুতুল ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে গিয়ে সমানে নাচছে।

পোখারার যা কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,আমার চোখে এই মেয়েটি তার অন্যতম। ঝড় তুফান যাই থাক ও রয়েছে আপন জায়গায়। যতোবার এই পথে গেছি ওকে, ঠিক ওকে নয় দেখেছি ওর সাবলীল নিরলস কার্যকলাপকে।

ট্রাফিক জাম নয়। তবু গাড়ী থামিয়ে সৈয়া বাহাদুর ওর সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কি বলে কি বুঝে জেনে নিলো। মেয়েটি জবাবে সামান্য ঘাড় নাড়ে।

জায়গা মিলবে।

বহু আরাধনার বাস্তব ফল লাভের মতো শোনালো সৈয়া বাহাদুরের কথাটা। যান-জায়গা দুদিক থেকে নিশ্চয়তা পেয়ে প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরাবার মন পেলাম আবার। যে পথে চলেছি চক্রাকারে তা নেমে গ্যাছে নীচের ঢালের দিকে। সম্ভবত শহরতলীর দিকেই গন্তব্য।

একপাশে গভীর খাদ। অন্যপাশে গম গাছের চিকন পাতায় লেগে আছে বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ফোটা। শুকনো ভুট্টার ক্ষেত। হুকো হাতে মাচার ওপর বসে থাকা দেহাতী মানুষ। পিঠের ঝোলায় শিশু বেঁধে সব্জীর বোঝা মাথায় বাজারমুখী রমণী। পোশাকে চেহারায়, টিলা উপত্যকা ঘন সবুজ গাছপালায় মিলে এ অঞ্চলকে হঠাৎ মনে হতে পারে, চল্‌ছি পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম পাহাড়ী কোনও এলাকা দিয়ে। এমন কি সৈয়া বাহাদুরের রেডিওতে যে লোকসঙ্গীত তার সুরের শব্দে বেশ মিল আমাদের পল্লীগীতির। নিরিখিলিতে কান রাখলে ভাষার সঙ্গেও কিছু সঙ্গতি পাওয়া যাবে সিলেট-চাটগাঁর আঞ্চলিক কথ্যকথার।

ছোট ঝর্ণা, বড় জলপ্রপাত। বিশাল পাহাড়ী নদী। দেখে মনে হলো নেপালের এতো পানি থেকে কিছু ভাগ বাংলাদেশ পেলে ভরবছরের জলীয় সমস্যা কমে যেতো।

ভাবনার ভেতর আচমকা একটা লাফ মারলো স্টারলেট। ড্রাইবার কর্কশ গলায় গালি দিচ্ছে। এক সত্তর পার হওয়া বুড়ী, পাশে কিশোরী নাতনী। দু'জনেই বাঁকা হয়ে আছে পিঠের ঘাসের বিরাট বোঝা নিয়ে। বুড়ী সবিনয়ে বল্লো, চোখে ভালো দেখি না বাবা। কিন্তু লছমী তোর আখ মরে থাকে কার ধান্দায়!

ব্রীজের ধারে সংকোচে সরে থাকলো ওরা। এখানকার রাস্তায় ঘাড়ে মাথায় বোঝাটানা প্রচুর নরনারী দেখেছি। সত্যিকারের অর্থেই যারা বৃদ্ধ। কিন্তু কর্মত্যাগী কেউ নয়। যে দেশের সাধারণ মানুষ নিরলস তাদের অনুন্নত থাকার কথা নয়। থাকে যেসব কারণে সে ভাবনা ছাড়িয়ে হঠাৎ মনে হলো কোথায় চলেছি?

ঘন মেঘলা আকাশ। সামনে থমথমে আদিগন্ত বন্যসীমা। অচেনা স্থান, দুর্যোগময় প্রকৃতি, দুইএ মিলে চৈতন্যকে করে আতংকিত। জাত হিসাবে যদিও এরা খবই বিশ্বস্ত। রাতভর অরক্ষিত গাড়ীও যদি পড়ে থাকে এরা ছুঁয়েও দেখবে না। হিমালয়ের আনাচে কানাচে একাকী ভ্রমণকরী কোনও মহিলা কখনো হামলায় পড়েছে এমন ঘটনাও বিরল। তবু মনে হচ্ছিলো টেরাই বা সমতল সীমান্তের দিকে যাচ্ছে না তো; যেখানে ছিনতাই রাহাজানী থেকে খুন জখম সবই চলে।

অবিশ্বাসী ভীরু এই সময়ে গাড়ী এসে দাড়ালো একটা বাড়ীর সামনে। লাল পাথরে তৈরী শ্রীহীন দেড়তলা। কালো স্লেটের ছাদে নানাজাতের মৌসুমী ফুলের বাহার। সদরের একধারে ফলবতী জাম্বুরা গাছ। শুভ এই প্রতীকটুকু ছাড়া সর্বত্র অলক্ষ্মীভাব। অথবা বলা যায় মানানসই গোছগাছের মধ্যেও ঘুরে বেড়াচ্ছে শোকের ছায়া।

অন্দরের তে-কোন সুন্দর বাগান দেখে অবাক লাগেনি। নেপালে দু'টি দৃশ্য সবার আগে চোখ টানে। মন্দির, ফুলের গাছ। মোড়ে মোড়ে দেবতার ঘর। পথেঘাটে অফুরন্ত পুষ্পবিন্যাস।

ট্যাক্সির শব্দে বেরিয়ে এলেন টকটকে সিদুরের টিপপরা এক মহিলা। যুক্তকরে হাসি মুখে বল্লেন, সোয়াগতম।

সৈয়া বাহাদুর বল্লে, সম্পর্কে আমার পিসি। এখানকার দেখাশোনা উনিই করেন। অসুবিধা হবে না। কাল সকালে আমি আপনাদের হাওয়াই আড্ডায় পৌছে দিতে আসবো।

মহিলা মিষ্টি গলায় হিন্দিতে বল্লেন, আসুন।

আমার ভেতরটা ততোক্ষণে লজ্জায় সংকোচে এতোটুকু। কব্জির ঘড়ি বলছে শহর ছাড়িয়ে মোটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ এসেছি। অথচ মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল চলছি। না জানি এপুচ্ছি কোন্ দুর্ঘটনার দিকে।

মহিলা নিজের নাম বল্লেন ইন্দুমতী। পিছু পিছু এপুলাম। চারটে ছোটছোট ঘর। কমন বাথরুম। মোটামুটি পরিছন্ন।

একটা ঘরে ঠাঁই পেয়ে বর্তে গেলাম বলতে হবে। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা হাওয়ার দাপাদাপি। বিকেলের দিকে কালো দৈত্যটা যে পাহাড় থেকে এসেছিলো, সেখানেই চলে গ্যালো।

এখন ভাঙ্গা রোদে, চলন্ত ভাসমান মেঘে দূরের পাহাড়ী ঢেউ

আরও রহস্যময়। আরও আকর্ষণীয়। মাথার ওপর উড়ছে সবুজ টিয়া, রং বদল করা মুনিয়ার ঝাঁক।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম বাড়ীর পেছনের খালের ধারে। একদিকে ঝুঁকে আছে ধানের চারা। অন্য দিকটা আলো করে আছে পদ্মবন। ওদের ভাষায় লাল কমলকে ফুল। ঘাটে একটা ডিঙ্গি বাঁধা। যেনো এইমাত্র কেউ নেমে গ্যাছে, অথবা রওনা হবে।

পদ্মবনের দিকে এগুচ্ছিলাম, পেছনে শুনলাম ইন্দুমতীর স্বর। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে। গলায় যেনো বিলাপ—দয়া করে ওদিকে যাবেন না।

ক্যানো?

বলতে পারেন সহানুভূতি জানাতে।

সহানুভূতি?

হাঁ জী। আপনি পরদেশী, জানা বোঝার কথা নয়। আমাদের এখানে দেহাতী লোকই বেশী আসে। তারা জানে বলেই আপনা থেকে...

কথা শেষ না করে কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। মনটানা চোখটানা পদ্মবিহার থেকে চলে এলাম বটে কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে থাকলো রাজ্যের কৌতুহল। এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য তপোবনের মতো শান্ত সুন্দর জায়গাটা পরিত্যক্ত?

এই যে তুমি এখানে কি করছো?

অতি রুক্ষ আওয়াজে কেউ যেনো ধাক্কা দিলো ঘাটের কাছ থেকে। ঘুরে দেখি রুগ্ন এক মহিলা। শুধু রোগাভোগা চেহারা নয়। দগদগে একজোড়া কয়লার টুকরো যেনো জ্বলছে দু'চোখে।

একে দেড়তলার একটি মাত্র ঘরের জানলায় দরোজায় দু একবার দেখেছি। ভগ্নাংশে। সামনা সামনি এতো অবাঞ্ছিত ভাবা যায়নি। সঙ্গত কারণেই শিটিয়ে এলাম। প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন হলো, তুমি বোর্ডার?

ঘাড় দোলাতে অভব্য চিৎকার দিয়ে উঠলো, টাকাকড়ি দাও?

দেবো।

কয়েক বছর আগে এসে দিতে পারনি! তাহলে তাহলে....

হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে তাকিয়ে থাকলো। চোখে গনগনে আগুন নেই। আর্তি। বল্লাম, উম তাহলে?

ডিংগি বেয়ে শ্রীকান্ত সিংকে খালের ওপারের ঐ রাক্ষুসে পাহাড় ডিঙ্গাতে হতো না। জানো তুমি... না তুমি কি করে জানবে... তুমি নাকি ভিনদেশী। কিন্তু সবাই জানে ঐ পাহাড়টা নিশিরাতে আয় আয় করে ডাকে। সে ডাক শুনতো শুধু শ্রীমন্ত। আমার ছেলে। ভোর হবার আগেই তাই সে রওনা দিতো ডিঙ্গির বেসাতি নিয়ে।

ফিরে আসতো না?

কখনো দুতিন দিন, কখনো হপ্তা গড়িয়ে যেতো। কিন্তু লাজবন্তীর বিয়ের খর্চার জন্য সেই যে গ্যালো...

ভীষন উজ্জল চোখ নিয়ে কি যেনো খুঁজলো অস্থিরভাবে। প্রায় জটাধরা চুলের গোছা মুঠিবন্দী হচ্ছে বারবার। আস্তে করে প্রশ্ন রাখলাম, লাজবন্তী এখন কোথায়?

রাস্তায় রাস্তায়।

কি করে সেখানে?

নাচে।

নাচে?

হ্যা গো। আমি নিজের চামড়ার এই চোখ দুটো দিয়ে দেখে এসেছি। একটা উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তিড়িং বিড়িং করে নাচে।

ঘাড় ঘুড়িয়ে একমুখ থু থু উড়িয়ে আবার বল্লো, ওর রোজগারের কানাকড়িও ছুই না আমি। সোয়ামী এই চালাটা রেখে গ্যাছে, ইন্দু তা থেকেই চালিয়ে যায়। লাজবন্তীর টাকার মুখে থুক থুক...

কথা বন্ধ করে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে থু থু ছিটাতে লাগলেন। ভেতর থেকে ছুটে এলো দুটো ঝি। স্বয়ং ইন্দুমতী। জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো মহিলাকে। সম্ভবত ঘরটিতে দিনেমানে দরোজায় শিকলতোলা অবস্থায় থাকেন। যাবার আগে ডিঙ্গিটার ওপর হামলে পড়ে বিকৃত স্বরে বলতে লাগলেন, ও আবার ফিরে আসবে। ডিঙ্গিরে তদ্দিনে তুই পুরান হয়ে যাস্‌নে লক্ষ্মী আমার। সোনা আমার। তেত্রিশ কোটি দেবতার দোহাই কথা না শুনলে...

শ্রীমন্ত নামটা কোথায় দেখেছি। কোথায়? সদর দরোজার ওপর নড়বড়ে দুটো খুঁটির মাথায় খাড়াকরা যে পলকা টিন, তার গায়ে ইংরেজী এবং হিন্দিতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—শ্রীমন্ত পান্থনিবাস।

ইন্দুমতী কখন যেনো বলেছিলেন, দিন দিন বোর্ডার বাড়ছে। সাদা চামড়ার ওরাও যাওয়া আসা শুরু করেছেন। নামটা বদ্‌লে আধুনিক করা হবে—শ্রীমন্ত পয়েন্ট।

শ্রীমন্ত তাহলে আধপাগলা এই বিধবা মহিলার ছেলে। দুরের পাহাড় ওকে ডাকতো। ও কি আধ্যাত্মিক লাইনের লোক ছিলো? কিন্তু মহিলা যে বল্লেন নৌকায় বেসাতি নেবার কথা। কি ধরনের বেসাতি?

ভারী কাচের চশমা পরলে পাহাড় অনেক কাছে চলে আসে। পিরামিডের মতো তে-কোণ মাথা ঢাকা অজান অচিন গাছপালায় আড়ালে সূর্য চলে গিয়ে সন্ধ্যা বিবর্ণ ম্যাটমেটে। পুরো এলাকা বিষণ্ণ মৌন প্রাগৈতিহাসিক ঋষি-মহিমায় উদাস।

প্রথম রাতের দিকে চাঁদ উঠে আরও কেমন হয়ে গ্যালো উদার কুটিল। ছায়া ছায়া শরীর মহাকালের একটি মাত্র চোখ নিয়ে পাহাড়টা যেনো কেবলি বলে যেতে থাকলো— অমিই ডাকি..আমি...

ইন্দুমতী কখন দেওদার বেদির ওপর এসে বসেছেন টের পাইনি। ওকে ঘিরে টাটকা দোলন চাপার সুবাস। অসলে তিনি নন। ছোট্ট বাগানে ফুটে আছে অজস্র পাহাড়ী চাঁপা। চাঁদের চিড়ল চিড়ল জোছনা, ফুলের ঘ্রানে, ধোয়া ধোয়া প্রকৃতি। সবে মিলে অনৈসর্গিক কিছু যেনো। এমন কি আমার পরিচিত কন্ঠস্বরও— পাহাড় কি সত্যি ডাকে?

ডাকে বৈকি। আর যার শোনার সে ঠিকই শোনে।

একটু চুপ থেকে পৃথিবীর স্তর থেকে নয়, স্তরান্তরিত অন্য কোনও জগৎ থেকে যেনো বল্লেন, দিদির ছেলে শ্রীমন্ত শুনতো। ওর পেটে যে গোটা পরিবারের ক্ষুধার আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলতো। না শুনে ও যাবে কোথায়? বাপটাকে খেয়েছে পাহাড়ী ধ্বস্। হাইওয়ে দিয়ে মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে যেতো। ছেলের মগজে কারিগরি বিদ্যের ছিটে ফোটাও ছিলো না। নৌকায় করে মনিহারী মাল ফেরী করতো ঐ খালে। চলতে চলতে একসময় সে পৌছেছিলো ঐ পাহাড়ের ওপার। ওখানকার লোকজনেরা ওকে খুব সমাদর করেতো। অতো খারাপ রাস্তায় কেউ যেতো না তো সৌখিন সওদা ফেরী করতে। এই যাওয়াই হলো কাল।

কাল?

তাছাড়া কি বলবো। দিদি বলতো অচেনা ঢালের মানুষ মেশামেশি করে কাজ নেই। শ্রীমন্ত হেসে বলতো অচেনা তো প্রথম দিকে থাকে সবাই। এমন কি জননী সন্তানের সম্পর্কও গড়ে ওঠে জন্মের পর। ওখানে সববাই চেনাজানা আপনজনের মতো। বিশেষ করে সর্দারের ছেলে। দোস্তি পাতিয়েছি আমরা। এরপর দিদি বাধা দেয়নি। যেখানে দোস্ত রয়েছে সেখানে দুষমন কড়া কামড় দিয়ে সহজে ক্ষতি করতে পারবে না।

তারপর?

দিদির মেয়েটা হাতেপায়ে ডাঙ্গর হয়ে উঠছিলো। শ্রীমন্ত ওকে লেখাপড়া কিছু শিখিয়েছিলো। ভালো বর মিলেছিলো সামান্য যৌতুকের বিনিময়ে। তো যৌতুক যতো কমই হোক পাক্কা সাত আট হাজারের ধাক্কা। সেবার আবার দেবতা খরা পাঠালেন। জায়-জমিনে শয়তান ঢুকলো। মানুষজন মিছিল করে চললো বরাহী দেবীর মন্দিরে। মাকে ফুল পয়সার পূজো দেওয়া হলো। মার স্বর্গ থেকে আসা প্রহরী ড্রাগনদেরও আলাদা করে। কিন্তু কাজ হলো না। হবে কি করে?

তার মানে?

পাপ। মহাপাপ। মর্তবাসী মানুষের পাপ। মার মন্দিরের চূড়াটা ছিলো খাঁটি সোনার। দামী পাথরের কারুকাজ তার ওপর। কে বা কারা সেটা চুরি করে পাচার করলো বিদেশীদের হাতে। একে চুরি, তায় দেশের বাইরে যাওয়া, দুই মহাপাপ একসঙ্গে। মাটি ক্যানো ফসল দেবে? আকাশ দেবে বৃষ্টি? বরুণ দেবতা মুখ ফেরালেন। ধরিত্রী মাতাও। পাহাড়ের মাথায় তেমন করে বরফ জমলোনা। ভূতপ্রেতের নিঃশ্বাসের মতো চারদিকে শুধু ধুলাবালি। এর মধ্যে এলো বিয়ের লগ্ন।

তিনি ঠোঁট বন্ধ করতে আমায় মুখ খুলতে হয়—উম্ তারপর?

ধারটার জুটলোনা। শ্রীমন্ত চললো ডিঙি নিয়ে। তার বিশ্বাস ছিলো দুর্গম পথের বাঁধা ডিঙ্গিয়ে বছরে চারবার সে যাদের জন্য চাহিদার সামগ্রী নিয়ে যায়, দুঃসময়ে তারা অন্তত সাহায্য করবে।

ভরা জোছনায় চোরা চোখের ঝরতে দেখেনি। রূপালী আলো। শিশির রং অশ্রু। ধোঁয়াটে নিঝুম প্রকৃতি। অদৃশ্য সেই ঢেউ থেকে উঠে এলো ইন্দুমতীর শোকার্ত কণ্ঠস্বর—সহযোগিতার হাত তারা বাড়ালো। খুব লম্বা হাত। খরার অভিশাপ ওদের মাটিতেও ছিলো। প্রধান পুরোহিতের শাপমুক্তির ইশারা ছিলো নররক্তে। অশুভ সময়ে এই চাহিদা পালা কবে করে আগে গ্রামের লোকেরাই মেটাতো। সেবারে তারা রাজী হলো না।

ক্যানো?

ঠাকুরের দাবী ছিলো একটু ভিন্ন রকমের। জোয়ান কাউকে হত্যা করে আঁজলাভরে ক্ষেতে ক্ষেতে রক্তদান নয়। প্রাচীন নাগকুসুম গাছের সঙ্গে জ্যান্ত কাউকে বেঁধে, একটু একটু করে খাবলে নেওয়া হবে অঙ্গ প্রতঙ্গের মাংস। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নিবেদিত হবে সেসব। যতোক্ষণ বলির মানুষ জীবিত থাকবে ততোক্ষণই শুধু গ্রহণ করা হবে তার হাড় মাংস রক্ত। নিষ্ঠুর এই প্রক্রিয়ার জন্য গ্রামবাসীরা হাতের কাছে একজন ভিন্নগোত্রীয় লোক পেয়ে সুযোগ নিতে দেরী করেনি।

একটু থেমে আবার বল্লেন, এদিকে আমরা পাগোলের মতো। বিয়ের লগ্ন। নিরুদ্দেশ বাড়ীর একমাত্র পুরুষ। হেন দেবতা নেই যার পায়ে মাথা কুটিনি। এমন কি গণেশ গুহার দুর্গম পথ ভেঙ্গে শিবলিঙ্গের কাছেও পূজা দিয়ে এসেছি। কিছুতেই যখন কিছু হয়নি তখন কনের বেশ ছুঁড়ে ফেলে লাজবন্তী গাছে থানায় রিপোর্ট লেখাতে। শুধু লেখানো নয় ওদের দলের সঙ্গে খুঁজতে বেরিয়েছে নিখোঁজ ভাইকে।

ইন্দুমতীর স্বর একেবারে বুজে এলো এসময়। ভাঙ্গা আবছা গলায় তবু বলে চল্লেন, বড়ো দেরী হয়ে গাছে। তাছাড়া, পথ জটিল অচেনা। ঐ যে বাড়ীর পেছনের পাহাড়, দুর থেকে সুন্দর দেখালে কি হবে ওর বুকভর্তি রক্তত্বষা। ও নাকি ঐ গ্রামের রিক্ষা

দেবতা। আগন্তুকদের সহজে ঢুকতে দিতে চায় না। ওরা যখন ঢুকতে পারলো তখন নাগকুসুমতলায় শ্রীমন্তের কংকালটা পড়ে শুধু।

আর গ্রামের মানুষ?

উধাও। তাদের পর্বতদেব নাকি আগাম খবর দিয়ে আগেই ভাগিয়ে নিয়েছে।

মানে পাহাড়ী গুপ্ত সুড়ঙ্গে ওদের প্রহরীরা সতর্ক ছিলো।

যার চোখে যেমন।

লাজবন্তীর চোখ কি দেখেছিলো?

ঐ পাহাড়ের পাথরের চেয়েও শক্ত দুধের মেয়েটা। একবিন্দু কাঁদেনি। ভাইএর সদগতি করে, বিয়ে ভেঙ্গে সরাসরি নাম লেখালো পুলিশের খাতায়। আমার বোন ছেলের শোকে আধ পাগোল। মেয়ের কান্ডে নির্স্থুর।

লাজবন্তী খারাপ কিছু তো করেনি। বরং নিজের সঙ্গে মাকে চালাবার মতো পরিস্কার একটা পথ বেছে নিয়েছে।

দিদি মুক্তি বোঝেন না। তার ঘরানার জন্য ঐ কাজ কলংকের। মেয়ের নাম মুখে আনেন না। তার হিসেবে লাজবন্তী আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করে না, মঞ্চে উঠে নাচে।

কি সৌভাগ্য এই লাজবন্তীকে আমি দেখেছি পোখারার চৌমাথার মধ্যবৃত্তে। যাবার পথে আর একবার দেখে যাবো। দেহ নয় এ.....

চিন্তায় বাধা এলো। ইন্দুমতী তখন বলছেন, লাজবন্তী ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য চাকরী নেয়নি। লেখাপড়ায় কমতির জন্য শুরুটা অমনি। দিনে দিনে অভিজ্ঞতায় প্রমোশন আসবে। সেটাই ওর কাছে কাজের আসল জায়গা। আমাদের এই পার্বত্য এলাকার কতোদিকে কতো কুসংস্কার অন্ধকার ঘাপ্‌টি মেরে আছে। ওর ক্ষমতার হাত সেসব দিকেই লম্বা হবে।

ঠান্ডা নামছে জাঁকিয়ে। বাইরে আর নিরাপদ নয় বলে তিনি এগুলেন। ভেতরের দিকে যেতে যেতে ছিড়ে যাওয়া ভাবনাটা জোড়া দিলাম—দেহ নয় এবার তাকাবো লাজবন্তীর মুখের দিকে। যে মুখ কল্পনায় উঠে আছে নাগাধিরাজের সর্বোচ্য চূড়াটিতে।

কালো রাত কালো জোছনা।

এমনি আরও একবার রহিমার ছেলেকে দলবেঁধে দেখতে এসেছিলো গায়ের মানুষ। একবাক্যে তারা স্বীকার করেছিলো এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছেলে গায়ের মধ্যে দুটি জন্মেনি। তেমনি আজ সন্ধ্যায় একে একে তারা আসছিলো, সান্ত্বনা দিচ্ছিলো, কোলাপুরের নুরু ফকিরের কথা বলছিলো, ফিরে যাচ্ছিলো ধীরে ধীরে।

রাত বাড়ছে ছেলেটা, ছট ফট করছে রোগের যন্ত্রণায়। রহিমা সারাদিন তাকে কোলে করে বসে আছে। মুহূর্ত্তের জন্য সরায়নি দৃষ্টির সীমা থেকে। পাড়ার কোন বুড়ির মুখে সে যেন শুনেছিলো, রুগ্ন সন্তানের দিক থেকে মায়ের চোখ সরে যাবার অপেক্ষায় কাছাকাছি ওতপেতে থাকে মালেকুল মওত। মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও মায়ের চোখ যদি থাকে সজাগ তবে কোনমতেই সে মেলে ধরার সাহস পায়না তার হিম শীতল মৃত্যুদণ্ডটি।

অনাহারে, অনিদ্রায় গত দুটি দিন কাটছে তার কিন্তু সাহস যে খুব পাচ্ছে তা নয়। বিশেষ করে রাত যখন ঘনিয়ে ওঠে, নীরব হয়ে আসে প্রকৃতি, পুরো পাড়ায় প্রদীপ বলতে যখন জ্বলে থাকে শুধু তারই ঘরের আলোটি, তখন থেকে সে বড় অসহায় বোধ করছে। হারাতে বসেছে যেন সাহসের শেষ সঞ্চয়টুকু। তখনই তার বেশি করে মনে পড়ে এমনি কালো রাতের অন্ধকারে আরও একটি সন্তানকে সে হারিয়েছে।

শিশুদের হাম তো হর হামেশাই হয়ে থাকে। তা নিয়ে গায়ের লোক খুব কিছু মাথা ঘামায় এমনও নয়। তবু তারা খবর দেয় নুরু ফকিরকে। সে এসে ঝাড়ফুক করে, পানি পড়ে দেয়, ভালো যারা হবার তারা ভালো হয়, যারা হয়না বুড়োরা এককথায় তার সমাধান বত্‌লে দেয় হায়াত নেই বলে। হাম নিয়ে তার শিশু যখন মারা গেছিলো তখন মন থেকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ঐ কথাটিকে। কেবলি মনে হয়েছে নুরু ফকির যেন ভুল করেছে কোথায়। হামের শিশুকে দিন রাত ভেজা গামছায় জড়িয়ে রাখাটা যেন ঠিক হয়নি, হামের ওপর নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী যেন ঐ ব্যবস্থা। স্বামীকে কথাটা সে বলেছিলো। জহর কান দেয়নি। বরং যে নুরু ফকিরের পেটে পাঠশালার পুরো বিদ্যে রয়েছে, বয়সে রয়েছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা তাকে যেন

হীন করা হচ্ছে বলেই মনে হয়েছে তার। শ্বাশুড়ীতো শুনেই মুখ বাঁকিয়ে বলে ফেলেছিলো, তবে আর ফকির ডাকা কেন, তুমিই করলে না কেন তোমার ছেলের ওষুধ পথ্যিটা।

শুনতে শুনতে রহিমার আবার মনে হয়েছে ভুলটি তারই। তার যে সন্দেহ যুক্তির জোর দিয়ে প্রমাণ করতে পারেনা সত্য বলে, সেখানে সে দায়ী করেছে স্নেহকাতর অবুঝ মায়ের বুদ্ধিহীন অন্ধ মমতাকে।

কিন্তু আজ বিকেল থেকে নুরু ফকির এসে তার সদ্য বসন্ত ওঠা একবছরের সন্তানের ওষুধ হিসেবে যখন গরম তেলের মালিস দিতে বল্লো, মন তার যেন বিদ্রোহ করে উঠলো তখনি। ঐ গা ভরা বসন্তের জ্বলন্ত ঘাগুলোতে গরম তেলের প্রলেপ? কি যে যন্ত্রণা হবে তার শিশুর, ভাবতে ভাবতে সে প্রায় চিৎকার করে বলেছিলো, না না এ হতি পারেনা, পারেনা...

জবাবে জহুর তাকিয়েছিলো কড়া চোখে। শাশুড়ী গড়গড় করেছিলো চাপা রাগে,ঘরের বৌএর এত বেহায়াপনা। শাশুড়ি-সোয়ামির ওপর দিয়ে কথা কয়।

কিন্তু মুখ ভরা হাসি নিয়ে নুরু ফকির উদার স্বরে বলেছিলো, আপনারা বৌ-এর ত্রুটি নিয়ে রাগ করবেন না মেহেরবানি করে। বৌ একে তো এলেমহীন অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েছেলে, তার ওপর রুগ্ন সন্তানের যন্ত্রণা। ওর কি আর হুঁশ রয়েছে এখন? যখন হুঁশে আসবে তখন দেখবেন নিজে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে।

জহুর মুখে কিছু বলে না কিন্তু গরজায় মনে মনে—বৌকে নিয়ে ঐ হয়েছে তার এক জ্বালা। বলতেও পারেনা কি করলে কি ভালো হবে, অথচ তারা যা ব্যবস্থা করতে যায়, তারই মধ্যে বাধা দেওয়াটা যেন বদঅভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে একরকম।

মাকে সে ইঙ্গিত করে ফকিরের নির্দেশ মেনে নিতে।

শাশুড়ি তেল গরম করে দিয়েছে। স্বামী জোর করে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছে রোরুদ্যমান সন্তানকে। নুরু ফকির প্রশান্ত মুখে লাগিয়ে গেছে প্রলেপ। গনগনে গরম প্রলেপ।

যাবার আগে বলে গেছিলো, ব্যবস্থা যা দিয়ে গেলাম, কালই খোদার মর্জি ঘা টানের দিকে যাবে।

সেই সান্ত্বনায় শান্ত হয়ে ঘরের একদিকে ঘুমোচ্ছে শাশুড়ী, আর একদিকে স্বামী। কিন্তু রহিমা না পারছে নুরু ফকিরের ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস করতে, না নিজের সন্দেহকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করতে।

রাত যত বাড়ছে, ছেলেটা ছটফট করছে যেন তত বেশি। কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলো। এখন গলা দিয়ে আওয়াজ বলতে ঘড়ঘড় করা একটা ভীতিকর শব্দ শুধু। এই শব্দের কাছে কোন মতেই সে স্বাভাবিক হতে পারছেনা। এ যেন

শব্দ নয়, মৃত্যুর জয়ধ্বনি। আরও একবার এই শব্দ শোনার দুর্ভাগ্য তার ঘটেছিলো। এমনি আঁধার কালো রাত ছিলো সেটাও। কোলে মৃত শিশু নিয়ে এমনি করে নিশি জেগে জেগে তার মনে হয়েছিলো এইরাত আর কখনও ভোর হবেনা বুঝি।

অতীতের সেই দুঃস্বপ্ন আবার যেন বাস্তব হতে চাইছে; ভয়ে ভাবনায় কাঠ হয়ে কাঁপছে সে। কিন্তু স্বামী বা শাশুড়ীকে ডাকবে তেমন সাহস তার নেই।

কিন্তু একসময় তারা নিজেরাই জাগলো। নুরু ফকিরের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত মানুষ দুটি আচমকা জেগে দেখলো রহিমা কাঁদছে বুক ভাঙা আর্তনাদে।

স্বামি ছুটে এলো। ঘুমুনোর আগে যে শিশুকে দেখেছিলো কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি যেতে, সে এখন ধীর, শান্ত। হিম শীতল তার দেহের স্পর্শ।

মর্ম্মান্তিক সেই যাতনার মধ্যেও রহিমা শুন্‌লো স্বামী তাকে রাক্ষুসী বলছে, শিশুর ক্ষীণায়ুর জন্য দায়ী করছে তার মাতৃ-ভাগ্যকে।

শাশুড়ী আঁচলে চোখ মুছে বিজ্ঞের মতো বল্লো, হবে না কেন অমন! দশ গাঁয়ের লোক মানে যার কেরামতি, তারই ওপর কিনা অবিশ্বাস।

শাশুড়ী রায় দিয়ে ফিরে গেল জহরের কাছে। নুরু ফকিরের বক্তব্যের সুর নকল করে বল্লো, কাঁনদিসনা বাবা। এই মওতের মধ্যি অমঙ্গল নাই কিন্তু। অরা যে ফেরেস্তা। আগে গিয়া যে বেহেস্তের আরাম তৈয়ার করি রাখে বাপ মাওর জন্যি।

বেহেস্তের আরাম? কান্না ভুলে মুহূর্তের জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রহিমা। বয়সের বলিরেখায় জরাজীর্ণ যে বৃদ্ধা মুখটি তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে তার কথা বিশ্বাস করতে পারলে কত না সুখী হতো সে। কিন্তু পারছে কোথায়। দুঃখে অনুশোচনায় বুক যে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ঐ অবুঝ মৃত শিশুটির কাছে তার যে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। যে শিশু পৃথিবীতে এসেছিলো, চেয়েছিলো তার রূপ রস গন্ধের মধ্যে একদা পরিপূর্ণ জীবন পেতে, তারা তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শিশু যদি কথা বলতে পারতো, প্রশ্ন করতো তাকে তবে সে কি জবাব দিতো?

একসময় কান্নার মধ্যে সে অনুভব করলো জহর তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাঙ্গা গলায় দিতে চাইছে সেই সান্ত্বনার বাণী, যা একটু আগে সে পেয়েছিলো তার মায়ের কাছ থেকে।

শিশুর দেহ থেকে দুটি হাত কানের কাছে তুলে নিলো রহিমা। শুনবেনা, কিছুতেই শুনবেনা সে ঐ কথাগুলো।

নিরন্তর ঘন্টা

একটু দূরে, বনঝাউ, পাহাড়ী ওক এবং শিশম বার্ণের পটভূমির মধ্যে টকটকে লাল সেডের জুনিয়র সেকশন, সেদিকেই মিলিয়ে গেছে ফাকরিয়া।

দুপাশে সবুজের প্রচুর সমারোহ, মাথার ওপর মেঘমুক্ত নীল আকাশ, সমুখে ঢেউ খেলানো স্কুল কম্পাউন্ড; মন্ত্রমুগ্ধের মতো দ্রুত এগুচ্ছে শাহরিয়ার। পথের উঁচু নীচু স্তর ভেঙে সে যখন জুনিয়র সেকশনের চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়েছে, তখনও বাচ্চাদের নীচু খেলার মাঠের রেলিংএর একটি কোণে দেখা যাচ্ছিলো ফাকরিয়ার ফিরোজা ওড়নার একটুখানি। প্রায় লাফিয়ে দূরত্বটুকু পেরোতে গিয়ে বাধা পেলো শাহরিয়ার। তার সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ান। ভুরুর কাছে ভ্রূকুটি, মুখে ছোট্ট একটু জিজ্ঞাসা, কাকে চাই সাহেব!

থম্‌কে দাঁড়াতে হয়েছিলো, ওদিকে ফিরোজার ওড়না অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং আচমকা থেমে গিয়ে শাহরিয়ারের মনে হলো, বিশ্রী একটা পরিস্থিতির মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে সে।

ছোট্ট একটা ঢোক গিলে, মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করে নিতে নিতে আর একবার তাকে ভাবতে হলো কাকে চাই। হাঁ চাই বৈকি। ফাকরিয়াকেই চাই। টাই-এর নটে ডান হাতটা উঠলো বুঝি নিজেরও অজান্তে, তারপর সে কথা বল্লো স্পষ্ট উচ্চারণে, ফাকরিয়া নাসরিনকে।

ভ্রূকুটির রেখা ঠিক মিলালো না কিন্তু স্বরে যেন পাওয়া গেল সম্ভ্রমের আভাস। ভিজিটার্স রুমের দিকে তাকে আহবান জানালো দারোয়ান। এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অগ্রসর হলো শাহরিয়ার। কিন্তু শিশু পার্কের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। কয়েকটা বাচ্চা খেল্‌ছে সকালের রোদে মাখামাখি হয়ে। তাদের লাল সোয়েটারে, স্কুল য়ুনিফর্মে শিশু চাঞ্চল্যের যে দুরন্ত রেখাগুলো, সেদিকে যেন দৃষ্টি আট্‌কে গেল। ফাকরিয়াকে নয়, সেই ক্ষণে তার মনের মধ্যে উদয় হলো যে শিশু-মুখ সে স্পষ্ট নয় তার স্মৃতির কাছে। দারোয়ানের তাড়া আবার তাকে সচল করলো।

খবর নিয়ে চলে গেল দারোয়ান এবং এই প্রথম একঘর শূন্যতার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে পারলো যেন

শাহরিয়ার নিজে। একটু পর হাওয়ায় দোলা ঐ পর্দার পাশে দাঁড়াবে যে এসে, তাকে দীর্ঘ এই পাঁচটি বছর পর কি বলবে, কি বলতে চায় সে? ভাবতেই কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল সব। ডিসেম্বরের দুরন্ত শীতের মধ্যেও কপালে অনুভব করলো ঘামের স্পর্শ।

দারোয়ান এসময় ফিরে এলো হৃৎপিন্ডের দ্রুত স্পন্দনকে স্তব্ধ করে দিয়ে। না, আসেনি সে। এখন ক্লাস নিচ্ছে ফাকরিয়া।

শাহরিয়ার উঠে দাঁড়ালো। জানতে চাইলো না কখন ক্লাস শেষ হবে, বরং ক্ষণ-মুক্তির আস্বাদ সারা দেহে অনুভব করতে করতে সে আবার যখন পার্কের রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালো তখন একটি বাচ্চাও নেই সেখানে।

দারোয়ান অবাক হয়েছে তার এই ভাবান্তরে। সতর্ক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো শাহরিয়ার। পিঠের কাছে প্রশ্ন একটা,ফাকরিয়া বাজীকে কিছু বলবো সাহেব?

কিচ্ছু না।

না-ঘুরেই জবাবটা দারোয়ানের উদ্দেশ্যে এক রকম ছুঁড়ে দিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের ঢেউ খেলানো পথ পার হলো শাহরিয়ার।

সে হাঁপাচ্ছে। বুকের দুদিকের সুঠাম পেশী ওঠা-নামা করছে দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, নাকের পাশে কিংবা ঠোঁটের নীচে স্বেদ বিন্দু ছিলো কি ছিলো না, তবু পকেট থেকে টেনে বের কর্‌লো রুমাল, গোছালো চুলের মধ্যে অজান্তে উঠে এলো একটি হাত।

কি ভাবলো দারোয়ানটা আর কি ভাবলো ফাকরিয়া ভাব্‌বার সময় পেলো না। মাথার দিকে হাত তোলার সময় কব্জির ঘড়িটার দিকে চোখ চলে গেছে, মনে পড়েছে আহসান মাহ্‌মুদের কথা। এই সময়টাতে দুজনের এক সঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়ার প্রোগ্রাম ছিলো হলিডে বলে। কিন্তু সে উৎসাহ বোধ করছেনা আর। আপিসের কাজে মারী এসে মাত্র দুটি দিনের জন্য দেখা করতে এসেছিলো একসময়কার সহপাঠী-সুহৃদ লরেন্স কলেজের সিনিয়র সেকশনের অধ্যাপক আহসান মাহমুদের সঙ্গে। যদি জানতো পাঁচ বছর পর ঘোড়াগলির পার্বত্য পথে এমনি নাটকীয় ভাবে দেখা হয়ে যাবে আবার ফাকরিয়ার সঙ্গে তবে এখানে আসতো কিনা সন্দেহ।

ফাকরিয়া তাহলে চাকরি নিয়ে আছে এখানে? ফিরে যায়নি তার শিল্পপতি বড় ভাই-এর আশ্রয়ে কিংবা...

শাহরিয়ারের চিন্তা দিক-মুখ পরিবর্তন করলো। তাহলে ফাকরিয়া একসঙ্গে ক্ষমা করতে পারেনি তার কুমারী জীবনের বাঞ্ছিত পুরুষ হাসান আবদুল্লা এবং বিবাহিত জীবনের অবাঞ্ছিত জন শাহরিয়ার কিবরিয়া কিংবা বড় ভাই আস্‌লামকে।

নতুন এই ভাবনার মধ্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করলো শাহরিয়ার। অনুতপ্ত হতে পারলে সে নিজে সুখী হতে পারতো

কিনা জানে না; কিন্তু চোখের ওপর অতীতের যে দিনটা নানা আকারে, নানারঙ নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে সেটাকে আজ আর মানতে পারছেনা আগের মতো নিষ্ঠুরতা দিয়ে। হাঁ বিয়ের দশ মাসের মধ্যে যখন জন্ম নিয়েছিলো একটি শিশু তখন তার ওপর সন্দেহে তিক্ত না হয়ে পারেনি শাহরিয়ার। পিতৃত্বের নব জাগ্রত স্নেহে নয়, নবজাতক মাংসপিন্ডটির জন্য সে অনুভব করেছিলো চরমতম জিঘাংসা।

কিন্তু সে আশ্চর্য হয়েছিলো, সেই শিশুটিকে জন্ম দিতে পেরে ফাকরিয়া হঠাৎ যেন লাভ করেছিলো নবজন্ম। বিয়ের সেই রাতটি থেকে কোনদিনই যে সহজ ছিল না তার কাছে, সেই ফাকরিয়া ঐ শিশু জন্মের পর তাকে দুর্বল দেহের একপাশে রেখে শাহরিয়ারের জন্য যে অপেক্ষা করছিলো অধীর আগ্রহে, বোঝা গেল যখন সে তাকে নিজে থেকে ডেকে সলজ্জ মুখে অনুযোগ জানালো,সবাই এমনি এলো ওকে দেখ্‌তে, কিন্তু তোমায় ডাকতে হলো.....

কথা তার অসমাপ্ত ছিলো কিন্তু চোখ আর মুখ ভরে ছিলো যে মাধুর্যের রেশ সেটুকু আদরে-চুমুতে ভরে দেবার অদৃশ্য চুক্তি ছিলো যার, সে তখন বুকের মধ্যে একরাজ্যের আক্রোশ এবং বেদনা নিয়ে থেকে থেকে জ্বলছে।

শাহরিয়ার চুপ করে ছিলো। কিন্তু কথা বলার নেশা যেন পেয়ে বসেছিলো ফাকরিয়াকে। সেই দুর্বল কিন্তু প্রাণবন্ত কণ্ঠ, পান্ডুর কিন্তু মুখর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে শাহরিয়ারের মনে পড়েছিলো ফুলশয্যার রাতটির কথা। তার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার সেই রাতে অনেক চেষ্টা করেও ফাকরিয়ার সুগঠিত কণ্ঠের একটি অস্ফুট ধ্বনির স্পর্শও সে ধরতে পারেনি তার উদগ্রীব শ্রুতির জগতে।

মাত্র দেহের সান্নিধ্যের মধ্যে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটলো, সেইটুকু সম্বল করেই শুধু তাদের ঘিরে আবর্তিত হলো বিবাহিত জীবনের পরবর্তী দিনগুলো। ফাকরিয়ার দিক থেকে মনের সম্পর্ক রচনার এতটুকু চিহ্ন পাওয়া গেলনা দীর্ঘ দশটি মাস ধরে।

তারপর সেই যখন তার সন্তানের জন্মের মধ্যে সহজ হতে চাইলো, প্রাণবন্ত হতে চাইলো, তখন তার সেই নব জাগরণের একটা বিশ্রী আপোসের অর্থ মনে এলো শাহরিয়ারের। সন্তানকে সে নিজের বলে ভাবতে পারলো না। ফাকরিয়াকে ঘৃণা করলো, হাসান আবদুল্লাকে মুঠোর মধ্যে পেলে খুন করতে পারতো সে তখন।

তার সেদিনের সেই বিভ্রান্ত বিদ্রোহ দিনে দিনে তাকে রুক্ষ করে তুলতে লাগলো; ফাকরিয়াকে আর সে সহ্য করতে পারতোনা। এবং তার এই বিরূপ মনের প্রকাশ্য চেহারা যেদিন স্পষ্ট হলো ফাকরিয়ার কাছে, সেদিন সে, যে চোখে অনেকক্ষণ

ধরে তাকিয়ে ছিলো শাহরিয়ারের দিকে, তার কি অর্থ ছিলো আজও বুঝতে পারেনি সে।

পরদিন সে যখন আপিসে, বয় বাবুর্চিরা সারভেন্ট কোয়ার্টারে, বুকে শিশু হাতে একটি মাত্র সুটকেশ সম্বল করে ফাকরিয়া কোথায় চলে গেছিলো কেউ বলতে পারেনি।

শাহরিয়ার করাচী থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছিলো শিয়ালকোট, ভেবেছিলো জীবনকে নতুন করে নতুন অর্থের মধ্যে আবার প্রাণবন্ত করতে পারবে, কিন্তু কেন যে তা হলো না তাও তার জানা নেই। সে শুধু অনুভব করলো তার পুরুষ-মনকে আরও অবসাদগ্রস্ত এবং হতাশ করে দিয়ে বসন্তের পর বসন্ত চলে যাচ্ছে।

প্রাচীন দেবদারুর গায়ে এলিয়ে, বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে রোমন্থিত করে আরও কত সময় তার কাটতো সে জানে না, সম্বিত ফিরে এলো চোখে মুখে ঠান্ডা সূচের মতো কিছুর স্পর্শে।

বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ী রোদ বড় ক্ষণস্থায়ী।

ভিজতে ভিজতে ফিরলো শাহরিয়ার। আহসান মাহ্মুদের বিরস মুখের অনুযোগ এবং সরস বাক্যের ঠাট্টা হজম করলো কিন্তু কথা বল্লো না একটাও।

বৃষ্টি কেটে গেল সন্ধ্যের আগে। কিন্তু প্রকৃতি ঢাকা গাঢ় কুয়াসায়। সাম্নে ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুন, চারদিকে পুরু দেয়ালের আবেষ্টন, দেহে ঘন পশমী আচ্ছাদন, তবু সেদিন পার্বত্য দেশের সীমিত ভূখন্ডের মানুষগুলোকে শীতের তীক্ষ্ণতা যেন নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিলো বারবার করে। এই মওসুমে এমন ঠান্ডা আর পড়েনি। ধূমায়িত কাওয়ার পেয়ালা নিয়ে আহসান মাহ্মুদ যখন সঙ্গীদের সঙ্গে সেই আলোচনায় মুখর, দরোজা ঠেলে আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো শাহরিয়ার।

বাইরে তুষারপাত শুরু হয়েছে কিংবা হবে এক্ষুণি। কিন্তু সে উত্তপ্ত বোধ করছে। বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। সমুখের শালে-কায়িলে ঢাকা যে পথ, সেটুকু পার হয়ে একবার ওপরের দিকে উঠতে পারলেই পাশের ঢেউখেলানো পথটা লরেন্স কলেজের জুনিয়ার সেকসনের। এই সন্ধ্যায় নিশ্চয় তার দুয়ার আগলে দ্বারী নেই, নেই সতর্ক চোখের কোনও অনুসন্ধান, তবু সে এগুতে পারলো না। বরং সকাল বেলার নিজের চাঞ্চল্যগুলো মনে হতে লজ্জাবোধ করলো।

তবু ঘরের মধ্যে আহসান মাহ্মুদের মজলিসী উল্লাস, হাসির উচ্ছ্বাস সব ছাপিয়ে তার কান ভরে থাকলো সেই মেয়েটিরই কণ্ঠস্বরে, মাত্র দশটি মাস একত্র বাসের ঘটনা ঘটেছিলো যার সঙ্গে তার।

পরদিন প্রত্যুষে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে সে সুদূর কাশ্মীর উপত্যকার দিক থেকে সূর্যকে উঠতে দেখলো, ঠান্ডায় জমে যেতে যেতে

ঘুমন্ত ঘোড়াগলির নিশ্চিন্ত বিশ্রাম দেখলো এবং বয়ের হাত থেকে গরম কফির পেয়ালা নিতে নিতে ভাবলো সে স্থির হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। গত রাত জাগরণের শোধ তুলবে সে সারাটি দিন ঘুমিয়ে।

ঘন কুয়াসা কাটছে। দূর্লভ পাহাড়ী রোদের ঝিলিমিলি সারা গায়ে মেখে হাসছে প্রকৃতি। অপেক্ষাকৃত হাল্কা মন নিয়ে শাহরিয়ার শুনলো ড্রেস নিতে নিতে আহসান মাহ্মুদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, শুনছো শাহু, আজ থেকে পিন্ডির বাস-গাড়ি সব ঘোড়াগলির বিকল্প পথ দিয়েই যাবে। মারীর রাস্তা ধ্বসে গেছে খানিকটা। দুটো হোটেল, চারজন শ্রমিক সেই ভাঙ্গা রাস্তার শিকার হয়েছে।

তা হবে..... শাহরিয়ার ভাবলো, গত রাতের প্রকৃতি বড় নির্মম ছিলো। কিন্তু আজ সকালের নির্মল আকাশ, অকৃপণ রোদের ঝলকে সে কথা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে না।

আহসান মাহ্মুদ কলেজের দিকে বেরিয়ে যেতে সেও বেরোলা ওভারকোট্টা কাঁধে ফেলে। বাইরে যখন এমন সুন্দর সকাল তখন বিছানায় পড়ে থাকার আলসেমীটা ক্ষমার অযোগ্য মনে হলো তার।

কিন্তু যেতে পারলো না বেশি দূরে। মার্চ করতে করতে ছোট্ট এক বাচ্চার সারি তার পাশ কাটাতে লাগলো। সে তাকিয়ে আছে, মুহূর্তে তার চোখের তারা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সনধানী দৃষ্টির দ্রুতগতি নিয়ে ঘুরছে অচেনা শিশুদের মুখে মুখে, বুঝতে পারলো যখন, তখন ওরা বক্রগতি নিয়ে এগিয়ে গেছে জুনিয়র সেকসনের শিক্ষা ভবনের দিকে। এবং পরস্পর কথা বলতে বলতে তাদের পেছনে আসছিলো যে শিক্ষয়িত্রী দুজন, তাদের একজনের দৃষ্টি তার ওপর। বড় চেনা দুটি চোখ।

শাহরিয়ার দ্রুত এগুলো নিজেরও অজান্তে। কিন্তু তারাও তখন এগিয়ে গেছে।

সারাটা দুপুর শাহরিয়ার সেখানেই কাটালো। বাচ্চাদের আরও একটা দল পার হলো কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে আবিষ্কার করতে পারলো না তাদের মধ্যে তার এবং ফাকরিয়ার মিলিত একটি মুখ রেখাকে।

আবার সে অস্থিরতা বোধ করছে, অধৈর্য হয়ে উঠছে, আবার তার মনে হচ্ছে, ফাকরিয়া হাসান আবদুল্লার কাছে যায়নি, ফিরে যায়নি তার বড় ভাই-এর আশ্রয়ে। এই স্মরণ তাকে অপরাধ বোধের বিশ্রী অনুভূতিতে ভরে তুললো। জন্ম হলো গ্লানিকর অস্বস্তির।

এলোমেলো পদচারণার মধ্যে সে এলো গতকালের ভিজিটার্স রুমে। খবর পাঠলো ফাকরিয়ার কাছে। ফাকরিয়া এলো না। বলে পাঠালো তার ক্লাস শেষ হতে আরও দু'ঘন্টা বাকি। আজ ফিরে গেলনা শাহরিয়ার, জানালো সে অপেক্ষা করবে।

ঘর থেকে বারান্দা এবং তারপর সে এসে দাঁড়ালো শিশুপার্কের সেই রেলিং-এর ধারে। সযত্ন লালিত ঘাসের চৌকোণ গালিচায় ডিগবাজী খাচ্ছে কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্য থেকে একটি প্রায় ছিটকে এসেছে রেলিং-এর নীচে। শাহরিয়ার চাঞ্চল্য অনুভব করলো, ঝুকে দাঁড়িয়ে একটি হাত বাড়িয়ে দিলো নীচের দিকে। বাচ্চাটিও হাত তুললো তার মাথার ওপর দিয়ে। মাঠের জমি রেলিং-এর ঘের থেকে চার পাঁচ ফুট নীচে থাকায় স্পর্শ সম্ভব হলো না। শিশুটি হাসতে হাসতে ফিরে গেল তার সঙ্গীদের খেলার বৃত্তে।

শাহরিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কোনাকুনি লাল টালির চালার ফাঁক থেকে ঝুলন্ত মানিপ্লান্টের ওপারে সম্মিলিত কিছু পাঠরত শিশুস্বর। হয়তো ওখানেই রয়েছে ফাকরিয়া। তার উপস্থিতি সে কি ভাবে গ্রহণ করেছে কে জানে। দু'ঘন্টা জীবনের কি দীর্ঘতম সময়!

দুহাত পেছনে মুষ্ঠিবদ্ধ করে সে পায়চারি ধরলো বাগানের দিকে। আম এবং মাল্টার ছায়ায় কাঠের কয়েকটা বেঞ্চ পাতা, ওদিকে আঙুরের জাঙ্গলা একটি। তার তলায় গুটি দুই পাকা ফল চুরি করা ছেলে।

বাগানটা ডান দিকে রেখে সে নেমে এলো একটু নীচের পথে। লাল সোয়েটার গায়ে কয়েকটি ছেলেমেয়ে একধারে, রোদে দাঁড়িয়ে। শাহরিয়ার সাগ্রহে তাদের সঙ্গে কথা বল্‌লো; তারা জবাব দিলো কিন্তু ভিড়তে চাইলোনা। স্কুলের নির্দেশ অমনি ধারা কিংবা ওরাই আগ্রহী নয় বড়দের সম্পর্কে। শাহরিয়ারের মনে হলো ওরাও যেন জানে তাদের মতো নিষ্পাপ একটি শিশু একদা নিগৃহীত হয়েছিলো তার কাছে, নির্বাসিতও। কিন্তু কোথায়? এই প্রথম তার মনে হলো সে বেঁচে আছে তারও তো প্রমাণ নেই কোন। ফাকরিয়া দুঃসহ অভিমানের তাড়নায় বেরিয়ে এসেছিলো সত্য কিন্তু এ চাকরি খুজে পেতে তার দেরি হয়েছিলো। তার মধ্যে কে জানে কি ধরনের সংগ্রাম করতে হয়েছিলো তাকে। তার বলি যে দেড়মাস বয়সের শিশুটি হয়নি তাই বা কে বলবে তাকে? হয়তো বেঁচেই নেই সে, তারই বৃহত্তর সন্ধানের তৃষ্ণা ফাকরিয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে এই শিশুশিক্ষা ভবনে।

সামান্য একটু শব্দ, কিন্তু চমকে উঠলো শাহরিয়ার। চৌকাঠের সঙ্গে পায়ে আঘাত পেয়েছে ফাকরিয়া। শাহরিয়ার যেন আবিষ্কার করলো অনেকক্ষণ সে ফিরে এসেছে ভিজিটার্স রুমের প্রায়-নির্জন ঘরটিতে এবং তার সঙ্গে এইমাত্র দেখা করতে এসেছে ফাকরিয়া।

শাহরিয়ার উঠে দাঁড়ালো। এগুতে গিয়েও থমকে থাকলো দুজনের মাঝে অনেকখানি ফাঁকা শূন্যতা রেখে। কিন্তু স্বর তার জড়তামুক্ত, অন্তরের তীব্র কোনও তাড়নায় এত বছর পরও

কোনও ভূমিকার কথা তার মনে পড়লোনা। ধীর গলায় সে প্রশ্ন করলো, সে কি বেঁচে আছে?

ফাকরিয়ার চোখে কেমন একটা ছাপ পড়লো, কিন্তু সে চেষ্টা করলো স্বাভাবিক হতে,এ খবর তোমায় কে দিল?

যদি সত্য হয় তবে আমার মন।

সে তোমায় ধোঁকা দিয়েছে।

উঃ.....

তারায় তৃষ্ণা

লিকার ঘন হয়নি বলে আধা কাপ চা পড়ে আছে টেবিলে। হাবুডুবু খাচ্ছে আধপোড়া একটা সিগ্রেট।

পেয়ালা তুলতে এসে জহুরা প্রশ্ন করলো, কি হলো?

তিনটি বর্ষার ধকল সহ্য করা জুতোয় বুরুশ চালাতে চালাতে মইন বল্লো, কিছু না।

চা না হয় বুঝলাম ভালো হয়নি। রুটিতে কি দোষ হলো?

অতো চড়া নূনের রুটি কি মুখে রোচে?

নূন বেশি হয়েছে?

জহুরা প্রশ্নটা যেনো নিজেকেই করলো। বারান্দার উঠতি রোদে বসে রগচটা শাশুড়ী। অমন একটি অঘটন ঘটলে প্রথম ধাক্কাটা ওখান থেকেই আসার কথা। আজ বরং তিনটির জায়গায় চারটি নিয়েছেন তিনি। ভালো করে তাকালো মইনের দিকে। গালের যে পাশটা দেখা যাচ্ছে, চাক চাক অন্ধকার সেখানে।

জুতো ঠিক করে, সার্ট নিতে গিয়েই ইস্ত্রি ঠিক হয়নি বলে মেজাজ করলো মইন। রুমালটা নাকি ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি। জহুরা না বলে পারলোনা, মতলবটা কি তোমার বলতো?

মইন তাকালোনা। ঝাঁঝ ঝাঁঝ গলায় বল্লো, লাইন দিয়ে, রীতিমতো যুদ্ধ করে কাপড় কাচা সাবান আনি। সামান্য একটা রুমাল তাও ঝকঝকে হয়না ক্যানো?

জহুরা থমথমে মুখে বল্লো, চোখটা কোন দিকে রেখেছো বলতো? এটাতো একেবারে আনকোরা নতুন রুমাল ... রি করলাম।

বেকায়দায় পড়ে মইনের গলা থেকে সামান্য একটু খাদ বেরোলো মাত্র। অকারণে কথা শুনে জহুরার গলার কাছটা ব এসেছে এক...শে। বল্লো, পাশের বাড়ির বুবু যা বলছিলেন ই তোমার বেলা ঠিকই ফলে গেলো।

কে বলছিলেন?

থাক, শুনে আর কাজ নেই তোমার।

জহুরা আঁচলে মুখ মুছে বেরিয়ে যাচ্ছিলো ঘর থেকে। মইন হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললো, বলতে হবে। নইলে অফিসে গিয়ে মোটেও মন বসবে না আজ।

জহরা বল্লো, আমি তো তাই চাই। আমায় যেমন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছো, তুমিও তেমনি কষ্ট পাও তোমার ওপারওয়ালার কাছ থেকে।

কষ্ট তো আমি এমনিই পাচ্ছি।

হাত ছেড়ে দিয়ে মইন হঠাৎ যেনো অন্য মানুষ হয়ে গেলো আবার। জহরাই তখন এগিয়ে এলো আপোসে, বুবু বলছিলেন রুমাল দিলে নাকি অবনিবনা হয়। আমি বাপু বিশ্বাস করি না ওসব কথাটথায়। আরও মানাযোগ দিয়ে রুমাল তৈরি করেছি। পছন্দ হয়নি বলো?

মইন ঘাড় নাড়ে জবাবে। কিন্তু অন্ধকার নামেনা মুখ থেকে। কাগজপত্র গুছিয়ে কিছু না বলে চলে যায় অফিসে।

বোকার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে জহরা। বাড়ির সমানের পথটা এ বছর আরও একটু চওড়া হয়েছে। স্টেশনের দিক থেকে একেবারে পাকা। ওখান থেকে দু নম্বর বাসে উঠবে মইন।

মোড় ঘুড়তেই ওকে আর দেখা যায় না। এক বছর আগেও এই জানলা থেকে, বাসের ভিড়ে তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেতো মইনকে। একবছরে এদিকটার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। একটা জলা ছিলো। ভর বছর কচুরি আর মশার ধুম। বর্ষায় আবার ডুবে মরতো বস্তির দুটো একটা বাচ্চা। এক সকালে হৈ হৈ করে এলো একদল যুবক। ডোবার পানাগুলো উধাও হলো রাতারাতি। আর এক সকালে ঘুম ভাঙলো অচেনা শব্দে। ছুটে জানলায় এলো। নীলচে পানি শুষে জলার তলায় খাবি খাচ্ছে ছোট ছোট মাছ। বস্তির বাচ্চারা কাদা ছেকে পরম উৎসাহে সংগ্রহ করছে সেগুলো।

এরপর ঝাঁক ধরে এলো মাটি ভর্তি ট্রাক। ডোবার চিহ্নও রইলো না। আশপাশের লোক খুশি হলো। মশা কমবে। সামনের সরু পথটাও চওড়া হবে। হলোও তাই। কালকের জলা রূপান্তরিত হলো আজকের দোকান-পসারিতে। ওষুধের দোকান একটা ছিলো। সেখানে বসলেন এসে একজন ডাক্তার। পান-বিড়ির দোকানটা দুভাগ হয়ে বসে গেলো দর্জির শোকেস। পাঠ্য বই আর কাঠের দোকান আগেই ছিলো। পাশ ঘেঁষে ঝলমল করলো একটা বিস্কুটের দোকান। স্বস্তি ছেড়ে কিছুটা বাঁচল কাছের লোকজন। হঠাৎ-আসা মেহমানের জন্য এখন আর ছুটতে হবে না বাজারের দিকে।

এক বিকেলে মইন এসে এমন খবরও বল্লো, খুব শীগগীর এ পাড়ায় একটা সুপার মার্কেটও নাকি হবে। মাপজোপ নেবার লোক-জনেরা নিত্যদিন নাকি ঘোরাফেরা করছে এদিকে।

পুবের ঐ আগাছা ভরা মাঠটা। যতো রাজ্যের বখাটের আড্ডা। প্রায় সন্ধ্যায় ওদের হলোপাথারি হল্লায় পাড়ার লোকের

বিরক্তির অন্ত থাকে না।

ওটা যদি মার্কেট হয়। ভাবতেও জহরার ভালো লাগে। চোখের ওপর দেখতে পায় অগুন্তি আলো। অফুরন্ত জিনিসপত্র। ঝলমলে পোশাক পরা মানুষজন। শোভন স্বাভাবিক নানা শব্দ।

মইন অবিশ্যি লম্বা শ্বাস টেনে বলেছিলো, তাতে আমাদের কি। মাস শেষে বারতি টাকা একটাও থাকে না যা দিয়ে সৌখিন কেনাকাটা চলে।

তক্ষুনি জবাবে না গেলেও মনে মনে প্রচুর কথা বলেছে জহরা। না হয় নাই হলো কেনাকাটা। বেড়ানো তো যাবে। সৌখিন জিনিস ঘরে না আসুক চোখের পর্দায় আসতে তো দোষ নেই। এই যে টুকিটাকি কেনা উপলক্ষ করে কখনো যায় বড়ো বড়ো মার্কেটগুলোতে।,রিকসা ভাড়া যায় কতো। এখানে মার্কেট হলে ওটা তো বাঁচবে। তাছাড়া বেড়াতে যাওয়াও যাবে যখন তখন। মইনের সময় না হলে পাশের বাড়ির বুবু, সতেরো নম্বরের সাহানা, সাবেরা। এতো কাছের আনন্দে বাগড়া বুড়ী শাশুড়ীও দেবেন না।

খবরটা যে মইন উড়ো আনেনি বোঝা গেলো আরও কিছুদিন যেতে।

আর শুধু কি সুপার মার্কেট। বাচ্চাদের জন্য, পাড়ার বাচ্চাদের জন্য তেকোন ছোট্ট একটা পার্কও হবে। লাল নীল হাজারটা গোলক বাতি জ্বেলে সবুজ পার্কটাকে নাকি স্বপ্নপুরী বানিয়ে ছাড়বে।

তা হতে পারে। খুশিতে খলবল করে উঠেছে জহরা। তেজগাঁয়ের দিকটা সেতো দেখেছে। প্রায় জঙ্গলের মধ্যে বাবা একটি টিনের চালা তুলেছিলেন। শেয়াল ডাকতো সন্ধ্যায়। সকাল হলে কা কা করতো রাজ্যের কাক। এখন সেখানে কি নেই! ভবন রুট ঝকঝকে রাস্তা। মওসুমি গাছ সাজানো আইল্যাণ্ড। পার্ক, ব্রীজ, মার্কেট, সিনেমা হল।

শেয়াল-ডাকা দিনগুলো আর কতোদিনের পুরোন। এখানে বাচ্চাদের পার্ক হলে, মার্কেট হলে---

উচ্ছ্বাসের মুখে শাশুড়ীকে বলে ফেলেছিলো। শিশু পার্কের নামে তিনি এমন চোখে তাকালেন, কুচিয়ে এতোটুকু হয়ে গেলো জহরা। তখনি তার মন খুবলে দিলো পুরোন সেই যন্ত্রণার কাঁটাটা। তিন বছরেও তার কোনও সন্তান নেই। তা না থাক, পাড়ার ছেলেপুলেরা তো আছে। সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছে। পরক্ষণে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা এমন হয় না, ঐ যে নতুন বুড়ো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বসেছে চেম্বার খুলে, এমন ওষুধ সে দেবে সমস্ত দোষ কেটে যাবে। হোমিওপ্যাথিতে কতো কতো অসম্ভব ব্যাপার নাকি সম্ভব হয়ে যায়।

শুকনো শুকনো মুখ, ভাসা ভাসা চোখ। মইনের সন্দেহ হয়।

চা খেতে খেতে জানতে চায় কারণ। জহরা ফ্যাকাসে হেসে বলে, না কিছুনা।

তুমি আমায় তোমাকে চেনাবে। আলবত কিছু।

বলছি তো কিছুনা। মা'র কথা মনে পড়েছে।

তবে আর কি খুকী। দুধের বোতলটা রেডী করো। রেখে আসি তেজগাঁয়ে তোমার মায়ের কাছে।

মইন পেয়ালা রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। জানলার পর্দা ফেলে একটু আদর করলো। হেসে বল্লো, আজও বুঝি সেই ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি হয়েছে।

জহরা চোখের পানি ঝরতে দেয়নি। শুধু ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিয়েছে একটু আলাদা লাইনে। হাতের পিঠে চোখ মুছে বলেছে, এ মাসেও কেরোসিন অনেক লেগে যাবে কিন্তু। সারাদিন সেকের জন্য গরম পানি রাখতে হয়। নইলে মা'র চলে না।

মইন বলেছে, ওহো একটা কথা তো বলা হয়নি তোমাকে। বাড়িতে গ্যাস আসছে যে।

বলো কি!

সত্যি। আজ যখন অফিসে যাইনা, বাড়িওয়ালা ডেকে তাই বল্লেন। বলতো কতো সুবিধে হবে তোমার।

তা আর বলতে।

ছোট্ট সুখবর। ব্যথা ভারী শরীর যেনো ঝরঝরে হয়ে গেছিলো সঙ্গে সঙ্গে। দিন দিন তেলের গ্যালনের দাম যা বাড়ছিলো, হিসেব করে খরচা করেও কুল পাওয়া যাচ্ছিলো না। ইস কতো যে সুবিধে হবে গ্যাস এলে!

কদিন আগে খোঁড়াখুড়ির কাজ শুরু হয়েছিলো পথে। নিশ্চয়ই গ্যাস লাইন। পরে জানা গেলো টেলিফোন। তা হোক। গ্যাসও এসে যাবে নিশ্চয়ই।

দিন দুই আগে রান্নাঘরের কোথায় চুলো বসবে, সিঙ্গল কি ডবল এসব জেনে গেছে বাড়িওয়ালার লোক এসে।

আজ সকালে হাসি মুখেই বাজার করতে বেরিয়েছিলো মইন। ফিরে এসে চা খাবার সময় মুখ ভারী। কি হলো সারাদিনে কিছুই বুঝতে পারলোনা জহরা।

দিনটা গেলো ছটফট করে। বার বার জানালায় দাঁড়িয়ে।

বিকেল, সন্ধ্যা, রাত। মইন ফিরলো নটার পর। পরিশ্রান্ত মুখ। ক্লান্ত শরীর। প্রশ্ন করতে সাহস পেলোনা জহরা। কখনো এমন রাত করে সে বাড়ি ফেরে না। তার দেরি দেখে কতো যে চিন্তায় ছিলো তাও বলতে পারলো না। চুপচাপ শুধু লক্ষ্য করে যেতে লাগলো স্বামীকে। শুতে এসে দেখলো ঘুম-কাতুরে মইন বসে আছে জানালার ধারে। থেমে থেমে সিগারেট টানছে।

বাইরে অন্ধকার, বাইরে কুয়াশা। কি দেখছে মইন। জহরা

নিঃশব্দে বসলো ঘোড়া টেনে। একসময় মুখ ঘোরালো মইন। বল্লো, দেরি ক্যানো হলো জিজ্ঞেস তো করলে না।

জহরা আস্তে আস্তে বল্লো, কাজ ছিলো নিশ্চয়ই।

উম, কাজই বটে।

মইনের ঠোঁটছড়ানো ধোয়াটে হাসি—সারা সন্ধ্যা বাড়ি খুঁজেছি।

বাড়ি ! এ বাড়ির কি হলো?

জহরা চমকে উঠেছে। মইন চেষ্টা করেছে স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে, এ বাড়ি এখন ভাগ্যবানদের দখলে চলে যাবে।

তার মানে?

মানে আমাদের এই শেওড়াপাড়া এখন থেকে শ্যামলী। নামে যেমন আধুনিক, পাড়ার চেহারাও হয়ে যাবে তেমনি। আমদের মতো ছাপোষা মানুষদের আর মানাবে না এখানে।

মইন সিগারেটের ছাই ঝাড়ছে। জহরা যেনো হঠাৎ বড় বোবা। এই তো কিছুদিন আগেও এখানে শেয়াল ডাকতো। দিনেমানে পুচ্ছের মশা মাছি। জলাটাকে মনে করা হতো অভিশপ্ত স্থান-বিশেষ। ভর বছর যার ভোগে লাগে একটি করে প্রাণবন্ত মানুষ। মাঠের ঐ দিকে অন্তগল আর অন্তগল। দায়ে না ঠেকলে সহজে লোক আসতে চাইতো না এদিকে।

সেই শেওড়াপাড়া হবে শ্যামলী। কিন্তু সেখানে ঠাঁই হবে না মইন জহরাদের।

পানি এলো চোখ ফেটে। মইন তাকিয়ে আকাশের দিকে। সে কি অভিযোগ কিংবা আর্তি জানাচ্ছে? কার কাছে?

জন্ম ১৯৫৫ ডিসেম্বর ১৬৩৫ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গ্রামে। বাবা [illegible] মুন্সী। মা হামিদা খাতুন।

পিতা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। সেই সূত্রে শৈশব কৈশোর বিভিন্ন শহরে। লেখার শুরুর দিকটা [illegible]। এ সময় সাপ্তাহিক 'যুগের দাবী'তে প্রকাশিত [illegible] 'গল্প'।

[illegible] শুরু স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। দীর্ঘদিন যুক্ত [illegible] সাংবাদিকতার সঙ্গে। বর্তমানে নিবেদিত শুধু লেখালেখির [illegible]

উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোর উপন্যাসসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাতাশ। উপন্যাসের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা একাডেমী, সুলেখা, লেখিকা সংঘ, কমর মুসতারি, নাসিরউদ্দিন স্মৃতিপদক।

ভ্রমণে প্রচণ্ড উৎসাহ। ঘুরেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। প্রিয় পাঠ্য সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন।